Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume –2, Issue-iii, published on July 2022, Page No. 41–69
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

দলিত সাহিত্য বিতর্ক : এক তাত্ত্বিক অভিনিবেশ

গণেশ যোদ্দার
গবেষক, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
ই-মেইল: joddarganesh@gmail.com

Keyword
দলিত, অ-দলিত, নিম্নবর্গ, উচ্চবর্গ, সাহিত্য, নন্দনতত্ত্ব, বৌদ্ধিক, আইডেন্টিটি, জাত, শ্রেণি, বর্ণবাদ, বিদ্রোহ

Abstract
তিন অক্ষরের একটি শব্দ সমগ্র ভারতবর্ষে তো বটেই ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল পর্যন্ত ত্রাস সঞ্চার করে চলেছে একথা বললে বুঝি আজ আর অতিকথন হবে না। বঙ্গভাষায় শব্দটি হল 'দলিত'। মূলে শব্দটি বৃহৎ অংশের মানুষের সমষ্টিগত আইডেন্টিটির মানক-শব্দ। যাকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছে এক বিশেষ সাহিত্যবর্গ, তার নাম হল 'দলিত সাহিত্য'। সেজন্য মূল ধারার নন্দনতত্ত্বকে অস্বীকার করে নির্মিত হয়েছে আত্মবীক্ষণমূলক ও নব্যবাস্তবতাকেন্দ্রিক দলিত নন্দনতত্ত্ব, যা কিনা দলিত সাহিত্যের সম্যক আলোচনার মানদণ্ড। তর্কবিতর্কেরও অন্ত নেই এই দলিত সাহিত্যকে নিয়ে। অর্জুন ডাঙলে, শরণকুমার লিম্বালে, সিদ্ধা লিঙ্গাইয়া, ড. অরবিন্দ মালাগাট্টি থেকে শুরু করে বাংলায় ড.অচিন্ত্য বিশ্বাস, মনোহরমৌলি বিশ্বাস, যতীন বালা, নকুল মল্লিক, ড. সনৎকুমার নস্কর, নীতিশ বিশ্বাস, ড. সুরঞ্জন মিদ্দে, কল্যাণী ঠাকুর চাঁড়াল, এমনকি তরুণ প্রজন্মের মধ্যে ড.মৃন্ময় প্রামাণিক, ড.কল্যাণকুমার দাস, ড. সুকৃতিরঞ্জন বিশ্বাস প্রমূখ সকলেই কমবেশি দলিত সাহিত্যের তাত্ত্বিক পরিপ্রশ্ন নিয়ে তাঁদের স্ব-স্ব সন্ধানী আলোক ফেলেছেন। আমরা অনেকে অনেকরকম ভাবে তা থেকে ঋদ্ধ হয়েছি। সমস্ত জিজ্ঞাসার যথাযথ সদুত্তর যে পেয়েছি তা নয়। সে কারণে একজন দলিত সাহিত্য জিজ্ঞাসু হিসেবে আলোচ্য নিবন্ধে সেই-সমস্ত প্রশ্নের সমাধানের চেষ্টা করেছি যে-সমস্ত প্রশ্ন দলিত সাহিত্যের পাঠক মাত্রেরই মনে বারংবার উঁকি দিতে থাকে। যেমন বলা যায়, দলিত কারা এবং কেন? সাহিত্য আবার দলিত হতে পারে কি? ললিত সাহিত্যের সঙ্গে দলিত সাহিত্যের পার্থক্য কোথায়? কেই বা দলিত লেখক ও পাঠক? কেনই বা দলিত সাহিত্য? এর বৈশিষ্ট্যই বা কী? এর কি স্বতন্ত্র ভাষা ও শৈলী আছে? দলিত নন্দনতত্ত্ব বলতে কী বোঝায়? দলিত সাহিত্যের সত্যতাও বা কোথায়? এর উদ্দেশ্য কিংবা সীমাবদ্ধতাও কোনখানে? দলিত সাহিত্যের সুপরিকল্পিত ভবিষ্যৎ কী? - এমন সব জিজ্ঞাস্য। উল্লেখ্য মূল আলোচনায় কোনো সাহিত্যিকের রচনার সবিস্তার আলোচনা সচেতনভাবেই অনুল্লেখ থেকেছে। তাত্ত্বিক অভিনিবেশের মধ্য দিয়ে দলিত সাহিত্য জিজ্ঞাসার বিভিন্ন দিক আলোচিত হয়েছে। শুধু তাই নয় , আলোচনার সমাপ্তিতে অন্বেষণ করা হয়েছে দলিত সাহিত্যের যুক্তিযুক্ত ত্রুটিগুলিও। স্বল্পকথায় বলা যেতে পারে, আজকের আলোচনাটি আসলে - দলিত সাহিত্য পাঠের ভূমিকা বিশেষ।

Discussion

দলিত সাহিত্য দর্শনের প্রেক্ষাপট :

এতকাল যত বিখ্যাত বিখ্যাত সাহিত্য রচিত হয়েছে তার সিংহভাগ বিষয়ের কেন্দ্রে কিন্তু স্থান পেয়েছে সমাজের সেই পিছিয়ে পড়া মানুষেরা। কিন্তু সে-সবে তাঁরা থেকেছেন Object মাত্র। কিন্তু তাঁরাও যে Subject হতে পারেন, তাঁদের কলমও যে ইতিহাস নির্মাণের দাবিদার; ইতিহাসই সে কথা লুপ্ত করে দিয়েছে। আসলে আমরা যে ইতিহাস পড়ি বা আমাদের পড়ানো হয় তা তো সমাজের বৃহৎ অংশের মানুষদের জন্য তৈরি অথচ অল্প সংখ্যক মানুষদের দ্বারা লেখা ইতিহাস। সেই ইতিহাস এলিটকেন্দ্রিক। ক্ষমতাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত পাঠই সেখানে হয়ে উঠেছে সে ইতিহাসের কেন্দ্রীয় বিষয়। যা থেকে জয়ী বা শাসিত বা ক্ষমতাধরদেরই স্বর শোনা যায়। মহাভারত যেমন জয় কাব্য। পাণ্ডবদের যুদ্ধ জয়ের কাহিনী। সে যুদ্ধে পরাজিত পক্ষও যে ছিল সেই স্বর অশ্রুতই থেকেছে কৃষ্ণরূপী রাজনীতিবিদদের চক্রান্তে। অর্থাৎ আমাদের নির্মিত ইতিহাস আসলে Political History বা রাজনৈতিক ইতিহাস। পার্লামেন্ট, পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি, ন্যাশনালিস্ট পলিসি সব রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানেরই ইতিহাস। People's History সেখানে অবলুপ্ত। তাছাড়া ভারতীয় সমাজের ভিত্তিমূলে আছে একটা Inequality-অসাম্য। এই অসাম্য Caste Phenomen-এর ফলশ্রুতি। আর এই জাত বিভাজনের দরুন ভারতীয় সমাজ Homo hierarchical সমাজ। ফলত সমাজে মানুষের অবস্থানে ক্রম-উচ্চতা বিদ্যমান। আর এই Caste Matter-কে উচ্ছেদের জন্য আন্দোলনের হাতিয়ার হিসেবে জন্ম নেয় দলিত সাহিত্য। তবে এর আগে কি এই দলিতদের স্বর আমরা শুনিনি সাহিত্যের পাতায়? শুনেছি বৈকি। কিন্তু আমাদের সেই শোনা প্রবর শ্রেণিদের বয়ানে। এর সাক্ষী আছে South Asian Studies- দক্ষিণ এশীয় অধ্যায়ন। যার মধ্যে রনজিৎ গুহের Subaltern Studies- নিম্নবর্গীয় অধ্যয়ন উল্লেখযোগ্য। সেখানে আমরা যেভাবে নিম্নবর্গের কথা শুনলাম তা তো শিক্ষিত উচ্চবর্গের প্রগতিচেতনার নিয়ন্ত্রণে, উচ্চবর্গের জবানিতে ও লেখনীতে। গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক জিজ্ঞাসার ছলে তো বলেই দিলেন 'Can the Subaltern speak?' তাহলে দাঁড়ালো নিম্নবর্গ কথা বলে পেশাদার ঐতিহাসিকদের লেখার মধ্য দিয়ে। এখানেও হেজিমনিক ফর্মেশনের ভিতর সাব-অল্টার্ন হারিয়ে যাচ্ছে। এভাবে ক্রমশ তারা হয়ে পড়ছে Political Outsider। যদিও দীপেশ চক্রবর্তী আবার রাজনীতিতে নিম্নবর্গের অংশগ্রহণকে জোরালো দাবি জানালেন। খুঁজতে চাইলেন ইতিহাসের সেই স্বর যা এতদিন চাপা পড়েছিল ভারতীয় এলিটকেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবিতার তলায়। এই আলোচনায় তাই আমরা দেখলাম নিম্নবর্গদের নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন যাঁরা তাঁরা সকলেই আগে থেকে মার্কসীয় দর্শনে দীক্ষিত। পশ্চিমী মননে স্নাত। পশ্চিমী যুক্তি দ্বারা শানিত। তাদের আলোচনায় নিম্নবর্গ এসেছে ঠিকই, নিম্নবর্গ রেসিস্ট করছে ঠিকই, কিন্তু হেরে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে না। জোর গলায় নিজেদের কথা বলতে পারছে না। কেননা তখনো পর্যন্ত আমরা Eurocentrism থেকে বেরিয়ে আসলেও Elitism থেকে মুক্ত হতে পারেনি। 'রাইটিং সোশ্যাল হিস্ট্রি' গ্রন্থের লেখক সুবীর সরকার সর্বপ্রথম সাব-অলটার্ন কালেক্টিভ থেকে বেরোতে শেখালেন। সাব-অলটার্নদের লেখার ভিতর দিয়ে সাব-অলটার্নকে সন্ধান শুরু হলো। রচিত হতে শুরু করল E. P. Thompson প্রার্থিত 'History From Below'। এইভাবে ধীরে ধীরে কলোনিয়াল পর্ব থেকে, তারপর post-colonial পর্ব থেকে সাবলটার্ন মুক্তি আন্দোলন শুরু হল। শ্রেণির গুরুত্ব হ্রাস পেলেও, বৃদ্ধি পেল কাস্ট বা জাতের বিভাজন। আর এই জাত ব্যবস্থাকে ধরে রেখেছে ব্রাহ্মণ্য শোষণের হাতিয়ার হিন্দু ধর্ম। যার দুই অস্ত্র শ্রুতিশাস্ত্র বেদ আর স্মৃতিশাস্ত্র মনুস্মৃতি। যেখানে ধর্ম হচ্ছে কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য নিষেধাজ্ঞামূলক বৈদিক নিয়ম পালন। যা কিনা অর্ডিন্যান্স ছাড়া আর কিছুই নয়। কালক্রমে এই ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞাগুলি পরিণত হলো আইনে। তাই এখন ধর্ম বলতে বোঝানো হয় ধর্মীয় ক্ষমতাবলে জারি করা নিষেধাজ্ঞা বা বিধান। তা তো প্রকৃত অর্থে Class Ethics। কিন্তু নিয়ম আর নীতি তো এক নয়। নীতি হলো Principles আর নিয়ম হলো Rules। নিয়ম ব্যবহারিক বা প্রাক্টিক্যাল অভ্যাসগত, কিন্তু নীতি ইন্টেলেকচুয়াল, বৌদ্ধিক কোনো কিছুকে বিচার করার ক্ষেত্রে কার্যকরী পদ্ধতি। হিন্দু ধর্মে নিয়ম সংহিতা মাত্র। নীতি এখানে বর্জিত। আর ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র এই নীতিবর্জিত নিয়মের শৃঙ্খলে শূদ্রদের আটকে রেখেছে শত শত বছর ধরে। আর সেই শৃঙ্খলকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে আম্বেদকরের হাত ধরে ভারতবর্ষে জন্ম নেয় দলিত সাহিত্য। জাত ব্যবস্থা, ধর্মীয়

অনুশাসন, মূলধারার সাহিত্যকেন্দ্রিক নন্দনতত্ত্বকে অস্বীকার করে আপন পরিচিতিকে আন্তর্জাতিক করে তোলার লড়াইয়ে বিদ্রোহ জানায় এই দলিত সাহিত্য। নন্দনতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে বাস্তবকে প্রতিষ্ঠা দিতে সংকল্পবদ্ধ হয়। তাইতো যাঁরা নিজেদের এহেন ইতিহাসের স্রষ্টা ও নির্মাতা তাঁদের দ্বারা রচিত সাহিত্যকে সমান অনুভূতি দিয়ে পড়া, বোঝা ও আলোচনা করার উপযোগী তাত্ত্বিক রূপরেখা নির্মাণ আমাদের আগামী প্রয়াস। তার আগে সাহিত্য কী? ললিত সাহিত্যের সঙ্গে দলিত সাহিত্যের পার্থক্য কী সে বিষয়ে একটু আলোকপাত করা যাক্ –

সহিতত্ত্বে সাহিত্য :

অমাময়ী নিশা কখনো সৃজনের শেষ কথা হতে পারে না। তাবৎ সৃষ্টির মধ্যে লুকিয়ে আছে 'বিস্ময়, প্রেম ও কল্পনা'।[১] এই ত্রিবিধ উপাদানের সহাবস্থানে গড়ে ওঠে সহিতত্ত্ব ভাব। আর সাহিত্য রচনায় মূলেও আছে এই সহিতত্ত্ব। সহিত অর্থেই সাহিত্য। সহিত শব্দের মধ্যে নিহিত আছে মিলনের ভাব। আছে সংযোগ স্থাপনের প্রয়াস। আর সাহিত্যের এই সংযুক্তি বা মিলনের প্রসঙ্গে সাহিত্যজিজ্ঞাসু রবীন্দ্রনাথের কী অভিমত তা আমরা জেনে নেব-

> "সহিত শব্দ হইতে সাহিত্য শব্দের ব্যুৎপত্তি। অতএব ধাতুগত অর্থ ধরিলে সাহিত্য শব্দের মধ্যে একটি মিলনের ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সে যে কেবল ভাবে-ভাবে, ভাষায়-ভাষায়, গ্রন্থে-গ্রন্থে মিলন তাহা নহে; মানুষের সহিত মানুষের, অতীতের সহিত বর্তমানের, দূরের সহিত নিকটের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ যোগসাধন সাহিত্য ব্যতীত আর কিছুর দ্বারা সম্ভবপর নহে। যে দেশে সাহিত্যের অভাব সে দেশের লোক পরস্পর সজীব বন্ধনে সংযুক্ত নহে, তারা বিচ্ছিন্ন।" [২]

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব মোতাবেক সাহিত্যের এই মিলন বা সংযুক্তির মোটামুটি তিনটি স্তর বিদ্যমান-
এক : ভাষার বন্ধনের মধ্যে শব্দের সঙ্গে শব্দের ব্যাকরণগত সংযুক্তি।
দুই : ভাবের সঙ্গে ভাষার নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ সংযুক্তি।
তিন : কবিমনের সঙ্গে সহৃদয় সামাজিকের অন্তরঙ্গ যোগসাধন এবং মানবজাতির দেশকাল সমাজগত এবং সংস্কৃতিগত সাহিত্য বা মিলন।

কিন্তু 'এহো বাহ্য'। কারণ সাহিত্য কথাটির অর্থ অধিকতর এবং এর বিস্তারও তেমনি ব্যাপকতর। তাই ব্যাকরণগত ও অলংকারগত অর্থকে অতিক্রম ক'রে সমাজ-সংস্কৃতিগত অর্থকে দ্যোতিত ক'রে থাকে। আর এই সহিতত্ত্বের ফলেই বর্তমানের প্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে অতীতের সঙ্গে ভবিষ্যতের এক অসীম মেলবন্ধন ঘটে। রচয়িতার রচনার গুণে অতীত ও ভবিষ্যৎ কাল তাদের সকল সিদ্ধি ও ঐশ্বর্য এবং সাধনা ও আশা নিয়ে স্ফুরিত হয় বর্তমান কালের অভ্যন্তরে । আর এভাবেই সাহিত্যের হাত ধরেই ভিন্ন দেশ ও ভিন্ন সংস্কৃতির 'নানা ভাষা, নানা মত ও নানা পরিধান' থাকা সত্ত্বেও সর্বপ্রকার ব্যবধান ঘুচিয়ে এক অন্তরঙ্গ ভাব-বন্ধনে গড়ে ওঠে এক মিলন মহান।

বস্তুত বহির্জাগতিক রূপ-রস-গন্ধ স্পর্শের বিলাস-বৈচিত্র্যে বিশ্বরঙ্গমঞ্চে অহরহ যে 'কান্নাহাসির-দোল-দোলানো পৌষ-ফাগুনের পালা' অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে, মানব অন্তরের অনুভূতির রঙে রঞ্জিত হয়ে এবং হৃদয়বৃত্তির জারক রসে জারিত হয়ে স্পষ্ট ভাষায় তার প্রকাশই সাহিত্য। কিন্তু প্রশ্ন হতে পারে, 'কেন মানুষ নিজের মনের ভাব প্রকাশ করতে চায়'? তার উত্তর- অপরের কাছে নিজের আনন্দের কথা ব্যক্ত করে আনন্দ বৃদ্ধি করা, দুঃখের বেদনা জানিয়ে অপরের সমবেদনা পেয়ে দুঃখের ভার লাঘব করা, ভয় বা বিস্ময়ের কথা ব'লে শান্ত নিরাপদ পরিতৃপ্ত হতে পারার জন্যই এই আত্মপ্রকাশ। তবে সেই প্রকাশই সাহিত্য যার মধ্যে আনুপূর্বিক সামঞ্জস্য আছে। আর সহিতত্ত্বের এই ধারণার সঙ্গে যুগপৎ ললিত ও দলিত সাহিত্যের আন্তঃসম্পর্ক বিদ্যমান। তবে ললিত সাহিত্যের সঙ্গে দলিত সাহিত্যের সংযুক্তি অপেক্ষা বিযুক্তি অধিক প্রকট।

বিধায় সৃষ্টিং ললিতাম্ :

সংস্কৃত '√লল্' ধাতুর সঙ্গে 'ত(ক্ত)' প্রত্যয় যোগে হয় 'ললিত'। পদ হিসেবে এটি 'বিশেষণ পদ'। এর আভিধানিক অর্থ হল 'সুন্দর' বা 'শোভন' কিংবা 'অভীষ্ট' বা 'ঈপ্সিত'।[৩] কালিদাস তাঁর 'রঘুবংশম্' কাব্যে ইন্দুমতীকে 'বিধাতার অপূর্ব সৃষ্টি (বিধায় সৃষ্টিং ললিতাম্)'[৪] বলে অভিহিত করেছেন। এখানে 'ললিত' শব্দের অর্থ 'অপূর্ব' অর্থাৎ 'মধুর'ই বটে। তবে উক্ত 'রঘুবংশম্' কাব্যে রাজা অজ তাঁর স্ত্রী ইন্দুমতীকে 'গৃহিণীসচিবসখিমিথঃ প্রিয়শিষ্যা ললিতেকলাবিধৌ' (অনুবাদে : "তুমি আমার গৃহিণী, মন্ত্রণায় সচিব, রহস্যালাপে প্রিয় সখী ও ললিতকলায় আদরণীয়া শিষ্যা")[৫] এই বলে প্রশস্তিমূলক বাক্য উচ্চারণ করে নিজের ইন্দুমতী-শূন্য হৃদয়কে প্রবোধ দিয়েছেন। তাহলে এখানে 'ললিত' শব্দের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে 'কলা' বা 'আর্টস '(arts); যা কিনা "ললিতকলা' বা ইংরেজি-'ফাইন আর্টস' (fine arts)। অর্থাৎ আলংকারিকদের মতে 'সংগীত','আবৃত্তি', 'অভিনয়' ও 'নৃত্য', এই চতুর্বিধ প্রকরণের সমাহার হলো 'ললিতকলা'। অন্যদিকে 'অক্সফোর্ড অ্যাডভ্যান্স লার্নার্স ডিকশনারি' (Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English) মতে 'fine 'arts' (ললিতকলা) বলতে বোঝানো হয়েছে–

> "Forms of art, especially painting, drawing and SCULPTURE, that are created to be beautiful rather than useful."[৬]

অর্থাৎ ললিতকলা হল আসলে অঙ্কন, ভাস্কর্য, স্থাপত্য- যা আসলে শিল্পের সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য সৃষ্টি, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তা বাস্তবায়নের জন্য নয়। আর সঙ্গতকারণেই কাব্য সাহিত্যের একটি প্রকরণ বা শ্রেণি হিসেবে 'ললিত সাহিত্যের' এই স্বতন্ত্র শিরোনাম সার্থক। অবশ্য সার্থকতার প্রধান কারণ বলা যেতে পারে দলিত সাহিত্যের বিরোধী হিসেবে অবস্থানের জন্য।

এখন আমরা 'ললিত' শব্দের আলংকারিক প্রয়োগ দেখে নিতে প্রয়াসী হবো- রূপ গোস্বামী তাঁর 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে নায়ক-নায়িকার ভাবের উদ্দীপক বা মনোভাবের প্রকাশকে বোঝাতে গিয়ে 'অলংকার', 'উদ্ভাস্বর' ও 'বাচিক' -এই তিন প্রকার 'অনুভাব প্রকরণে'র কথা বলেছেন।[৭] যেখানে আবার দশ প্রকার 'স্বভাবজ অলংকার'-এর মধ্যে অন্যতম অনুভাব হিসেবে তিনি 'ললিত' অনুভাবকে উল্লেখ করেছেন।[৮] 'উজ্জ্বলনীলমণি' মোতাবেক "অঙ্গাদির বিন্যাসভঙ্গি, সৌকুমার্য ও ভ্রুবিক্ষেপের মাধুর্য প্রকাশকে ললিত বলে।"[৯] এখানে ললিত আসলে নায়ক বা নায়িকার একটি 'গুণ' যার চমৎকারিত্ব একে অন্যকে মুগ্ধ ও আকর্ষণ করে। অর্থাৎ ললিত কথার অর্থ দাঁড়াল আনন্দদায়ক অনুভাব বা গুণ।

ললিত সাহিত্য : সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য :

'ললিত' শব্দের অর্থ না হয় সন্ধান করা গেল; কিন্তু ললিত সাহিত্য কী? এর বৈশিষ্ট্যই বা কী? সেই উত্তর প্রদানে ব্যাপৃত হয়ে প্রথমে ললিত সাহিত্যের সর্বজনগ্রাহ্য কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে চাই-

এক : ললিত সাহিত্যের স্রষ্টার প্রচেষ্টা (attempt) হবে আনন্দদায়ক রূপ নির্মাণ।

দুই : ললিত সাহিত্যের শিল্পরূপ হবে এমন যার মাধ্যমে সহৃদয় সামাজিককে আনন্দ প্রদান করা হবে ।

তিন : ললিত সাহিত্যের শিল্পরসিক তিনিই হবেন যিনি 'বিশুদ্ধ আনন্দ' বা 'রস' আস্বাদন করবেন।

চার : ললিত সাহিত্যের যে জগৎ তা কল্পনার জগৎ, যে জগতের স্রষ্টা স্বয়ং ঈশ্বরসদৃশ। আসলে সাহিত্যিকের আত্মপ্রকাশ-কামনা থেকেই জন্ম নেয় ললিত সাহিত্যের 'সৃষ্টি ও নির্মাণে'র প্রেরণা।

পাঁচ : ললিত সাহিত্যের শিল্পতত্ত্বের সঙ্গে বেনেদেত্তো ক্রোচের নন্দনতত্ত্বের সাদৃশ্য লক্ষ করে বলা যেতে পারে- ললিত সাহিত্য "নৈতিক বা অর্থনৈতিক কার্যকারিণী-বৃত্তির ক্রিয়া-বহির্ভূত একটি জ্ঞানাত্মিকা ব্যাপার।"[১০] যেখানে মানবচৈতন্যের 'নৈয়ায়িক জ্ঞান' (logical knowledge) এবং 'প্রাতিভাসিক জ্ঞান' বা 'স্বজ্ঞা' (intuitive knowledge) এই দ্বিবিধ জ্ঞানের বৃত্তির প্রকাশ ঘটিয়ে থাকে ললিত সাহিত্য।[১১]

ছয় : ললিত সাহিত্যের প্রধান বক্তব্য হল–'শিল্পের সার্থকতা শিল্পে'। অর্থাৎ ললিত সাহিত্যিকরা বলে থাকেন কাব্য বা

সাহিত্য হলো বিশুদ্ধ বিজ্ঞান। আবার বিশুদ্ধ শিল্প হলো উদ্দেশ্য-নিরপেক্ষ, আপন প্রভায় প্রদীপ্ত। কোনো হিতকর ভূমিকা পালন করে থাকে না এই ললিত সাহিত্য। তাঁরা মূলত ফরাসি সাহিত্যিক গোতিয়ের 'I'art pour I'art' তত্ত্ব বা ইংরেজিতে 'Art for Art's sake' বা বাংলায় 'কলাকৈবল্যবাদ' তত্ত্বে আস্থা রাখেন।

সাত : ললিত সাহিত্যিকদের ধারণা জীবন থেকে উপাদান সংগ্রহ করে শিল্প গড়ে ওঠে না বা সাহিত্য রচিত হয় না; বরং জীবন শিল্পকে অনুকরণ করে মাত্র। বিদেশি ভাষার সাহিত্যে এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ফ্রান্সের গোতিয়ের ও বোদলেয়ার, আমেরিকার এডগার অ্যালান পো, ইংল্যান্ডের অস্কার ওয়াইল্ড প্রমুখ ।সংস্কৃত সাহিত্য প্রকৃতই ললিত সাহিত্য। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিবিশ্বে আমরা ললিত সাহিত্যের বিশুদ্ধ আনন্দের আস্বাদন লাভ করেছি। কিন্তু প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বাস্তবজীবন-বিমুখতা রবীন্দ্র-মননে ও প্রাণনে কখনো প্রাধান্য লাভ করেনি। রবীন্দ্রনাথের মতে, সাহিত্যের বাস্তবতা বস্তুর নিত্যতার উপর নির্ভরশীল। তাই রাবীন্দ্রিক বাস্তবতার সঙ্গে 'আইডিয়া' ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সুতরাং রবীন্দ্র-সাহিত্যে ললিত সাহিত্যের স্বাদ মিটলেও তথাকথিত ললিত সাহিত্য থেকে তা মূলত আলাদা।

আট : ললিত সাহিত্য ভাববিশ্বে তার রূপনির্মাণ করে থাকে। বস্তুবিশ্বের সঙ্গে তার বিরোধাত্মক সম্পর্ক। ললিত সাহিত্যের জগতে যতক্ষণ না পর্যন্ত কোনো বস্তু প্রয়োজনীয় হয়ে উঠতে পারছে কিংবা কোনো বস্তু সুখ বা দুঃখের কারণ বলে পরিগণিত না হচ্ছে ততক্ষণ ললিত সাহিত্যের জগতে সেই বস্তুর কোনো প্রবেশাধিকার নেই।

নয় : ললিত সাহিত্যে 'বিষয়বস্তু' (content) গৌণ; সাহিত্যের 'রূপ' (form)ই সেখানে মুখ্য।

দশ : সৌন্দর্যবোধ ও মঙ্গলবোধ উদ্রেক করে পাঠক ও সমালোচক হৃদয়ের শূন্যতার সংকট মোচন করাই ললিত সাহিত্যিকদের প্রধান লক্ষ্য। বাস্তব জগতের প্রতি তারা গভীরভাবে উদাসীন।

এই দীর্ঘ আলোচনার অন্তিমে ললিত সাহিত্যের সংজ্ঞা নির্ণয় প্রসঙ্গে একথা বললে বুঝি অত্যুক্তি হবে না যে, লালিত্যই যে সাহিত্যের প্রধান গুণ, 'আইডিয়া'ই একমাত্র যে-সাহিত্যের সত্য বস্তু, রূপরসময় জগৎ ও সৌন্দর্যময় জগৎ যার উদ্দীপন বিভাব; যে-সাহিত্য বস্তু পৃথিবীর কার্যকারণসম্পর্ককে পরিহার করে এক অখণ্ড আদর্শলোকে গড়ে তোলে নানান কল্পপ্রতিমার চিত্রাল্পনা; যে-সাহিত্যে ভাববাদী দর্শনের একাধিপত্য লক্ষ করা যায়; এমনকি যে-সাহিত্যে জাগতিক সৌন্দর্যকে আবৃত ক'রে ও অতিক্রম ক'রে 'সুন্দর' নিজে প্রতিষ্ঠা পায়, তেমনি আবার পরম সুন্দরের কল্পনালোক যে সাহিত্যের মধ্যে জাগতিক বস্তুকে 'সুন্দর' ক'রে তোলে তাই-ই হল ললিত সাহিত্য।

ললিত সাহিত্য বনাম দলিত সাহিত্য :

সাহিত্য তো আর নিছক জীবনালেখ্য নয়, তা আসলে জীবনের উদ্ভাস। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জীবন আর উদ্ভাসিত জীবন তাই আলাদা। কেননা, কালে-কালান্তরে বিবর্তিত ও রূপান্তরিত রীতি-নীতি, প্রথা-পদ্ধতি, বিশ্বাস-সংস্কার সমাজের সদস্য হিসেবে মানুষ স্বাভাবিক ভাবে অনুধাবন করতে পারে না। অর্থাৎ অভ্যাসের জগতের মধ্যে নিজেকে চিনতে পারে না মানুষ। সুতরাং মানব ও মানবেতর জীবনের বক্র-বিচিত্র বিকার ও বিকাশকে, কার্য ও কারণকে নিরূপণ ও বিশ্লেষণের দ্বারা সাহিত্যের পাতায় চিত্রিত করে তোলেন জীবন-শিল্পী। আর তখনই আমরা বায়বীয় কল্পনা ভুলে কালগত ও স্থানগত এবং সামাজিক অবস্থানগত আপেক্ষিক তাৎপর্যে সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে যাচাই করি আমাদের আনন্দ ও বেদনাকে, রণ, রক্ত-সফলতাকে। গড়ে তুলি জগত চেতনার নব নব প্রতিবেশ। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে, হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ শাস্ত্র, সমাজ আর সরকারের বিধি- নীতি ও আইনের খড়্গো বলিপ্রদত্ত। এমনি করে নিয়মের খাঁচায় আবদ্ধ মানুষ যান্ত্রিক জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পীড়ক ও পীড়িত রূপে স্থানুর জীবনে ও মননে নিশ্চিত ও আশ্বস্ত থেকেছে। তাই সাম্প্রতিককালের সাহিত্যে বিশেষত দলিত সাহিত্যে রমণীয় সৌন্দর্য, আনন্দপূর্ণ ললিতকলার প্রকাশ, সুন্দরের আরাধনা প্রভৃতি অপেক্ষা গুরুত্ব পাচ্ছে অবহেলিত, বঞ্চিত ,নিপীড়িত, মানুষদের জীবন ও জীবনসম্পৃক্ত সমস্যাবলী। তবে এ বিষয়ে দলিত সাহিত্যই অগ্রগণ্য। তাইতো শাস্ত্র-সমাজ-সরকার-শাসিত ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক, আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিকূল পরিবেশে ঈর্ষা-অসূয়া-ঘৃণা-বঞ্চনা-প্রতারণা-কার্পণ্য-নির্দয়তা-রিরংসা-জিঘাংসা-জিগীষা কেমন করে মানুষের জিজীবিষাকে গলা টিপে হত্যা করছে, কেমন করে মানুষের জীবনে যন্ত্রণা ও অভিশাপ ডেকে আনছে তা দেখা

ও দেখানো, জানা ও জানানো, এবং বোঝা ও বোঝানোই দলিত সাহিত্যের অন্যতম উদ্দেশ্য। আর এখানেই সাহিত্যের বাস্তবতা থেকে ললিত সাহিত্য অপেক্ষা দলিত সাহিত্য স্বতন্ত্র।

'অতাথো দলিত জিজ্ঞাসা' :

বোঁচা নাক। উদোম শরীর। ফাটাচটা পা। মোটা ঠোঁট। গায়ের রং ময়লা। ঘামে ভেজা দেহ। মুখ দিয়ে গন্ধ ছোটে। পোশাকে মলিনতার দাগ। ঘাড়ে সর্বদা গামছা শোভা পায়। কার পরনের শাড়ির আঁচল কোমরে জড়ানো। কেউ সকাল থেকেই বাসন পরিষ্কার করে। কেউ কোদাল হাতে সভ্যতার ধ্যান ভাঙ্গায়। কেউ ট্রেনে ঝুলতে ঝুলতে গিয়ে বাবুর বাড়ি রান্না করে। কেউ বা কাগজ কুড়ানোতেই ব্যস্ত।পথের কুকুর দেখামাত্রই আলাপ করে ওদের ভাষাতেই। কেউবা ড্রেনের ময়লা পরিষ্কার করে। শবদেহ নিয়ে যায় কেউ। তাঁরা কেউই হাঁটে না ছোটে--জাত্যান্ধ উচ্চবর্গের আজন্মলালিত বিদ্যাবুদ্ধিজনিত সংস্কারের 'এরা' কিংবা 'ওরা'ই হলো অস্পৃশ্য, নমঃশূদ্র, চণ্ডাল, দলিত। আসলে 'দলিত' শব্দটি কানে এলেই 'বাবু' সভ্যতার চর্মচক্ষে ফুটে ওঠে 'এই সব' মানুষদের বহিরঙ্গিক অবয়ব। যে-অবয়ব বর্ণক্রোধীদের 'দয়া' নামক ব্যাধির আক্রান্তে ক্ষত বিক্ষত। এই সমস্ত বাস্তব ছবিই হলো উচ্চবর্গের দলিত-চেতনা। অ-দলিতদের দলিত-চেতনায় নিম্নবর্ণ ও নিম্নবর্গের মানুষদের অন্তরাঙ্গিক-অবয়ব কখনো প্রতিবাদ হয়নি। নিম্নশ্রেণিদের মেধা মনন ও চিন্তার উৎকর্ষতাকে খর্ব করে দেওয়ার উদগ্র কামনায় সর্বদা ব্যাপৃত থেকেছে উপরতলার মানুষরা। বুদ্ধিবৃত্তির কেন্দ্রে প্রবেশের পথ নীচুতলার জন্য ছিল অবরুদ্ধ। দলিতদের অজ্ঞেয়কে জানবার দুর্দমনীয় প্রজ্ঞাকে কখনোই স্বীকার করেনি বর্ণবাদী সমাজ। আর্যভাষা দিয়ে আধিপত্য কায়েম করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ভাষাকে মৃত্যুপথে দিয়েছে ঠেলে। আর ব্রাহ্মণ্যবাদের দলন প্রক্রিয়া থেকে নিম্নবর্ণের মানুষদের মুক্তি দিয়ে তাদের বোঝানো আত্মসম্মান ও আত্মমর্যাদার পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলনের নাম দলিত সাহিত্য।

'দলিত' শব্দটি এবং 'দলিত সাহিত্য' কথাটি সাম্প্রতিক বিশ্বে বহুল প্রচলিত। যদিও 'দলিত' শব্দটি অবলুপ্তির জন্য অনেকেই লড়াই করছেন। ১৯৩২ সালের ১ মে এক ব্রাত্য সংগঠন লোধিয়ান কমিটির কাছে "দলিত" শব্দের অবলুপ্তির জন্য দাবি পেশ করেন। দাবি জানানো হয় 'দলিত' শব্দটি ঘৃণাব্যঞ্জক এবং মানহানিকর। ফলে 'ডিপ্রেসড' বা 'দলিত' শব্দটির পরিবর্তে ১৯৩৫-এর 'ভারত শাসন আইনে' সংযোজন করা হল নতুন একটি শব্দ 'সিডিউল্ড' অর্থাৎ 'তপশিলি'।[১২] কিন্তু বর্তমানে ভারতীয় সাহিত্যের অন্যতম ধারা হিসেবে যে সাহিত্য বিশেষভাবে আসন সুদৃঢ় করেছে তা হল 'দলিত সাহিত্য'। তা কিন্তু 'তপশিলি সাহিত্য' এই শিরোনাম নিল না। তাই এখন কয়েকটি প্রশ্ন আমাদের বিবেকী বীক্ষণকে ধাক্কা মারে। তা হলো নিম্নরূপ—

১. 'দলিত' কারা এবং কেন?
২. 'দলিত' শব্দটি বর্জনের? না, অর্জনের?
৩. 'দলিত সাহিত্য' বলতে কোন্ সাহিত্যকে চিহ্নিত করা হবে?
৪. অ-দলিতদের কলমে বিধৃত দলিত আত্মনের বেদনা-ভাষ্যকে কি দলিত সাহিত্য বলা যাবে না?
৫. দলিত লেখক কারা এবং কেন?
৬. দলিত সাহিত্যিকের লেখনী যদি প্রেম ও কল্পনাকে লিপিবদ্ধ করে তা কি দলিত সাহিত্য হবে না?
৭. কেন দলিত সাহিত্য?
৮. সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে দলিত সাহিত্যের স্বরূপ কী?
৯. দলিত সাহিত্যের পাঠক কারা?
১০. দলিত সাহিত্যের ভাষা-ই বা কী?
১১. দলিত সাহিত্যের কি বিশেষ শৈলী আছে?
১২.দলিত নন্দনতত্ত্ব বলতে কী বোঝায়?

১৩. দলিত সাহিত্যের সত্য-ই বা কী?

১৪. দলিত সাহিত্যের উদ্দেশ্য কী?

১৫. দলিত সাহিত্যের সীমাবদ্ধতা কোথায়?

১৬. দলিত সাহিত্য কি বর্তমান-সর্বস্ব? না, তার সুপরিকল্পিত কোনো ভবিষ্যৎ আছে?

এখন এই জিজ্ঞাসাগুলির সদুত্তর অন্বেষণই আমাদের আলোচনার আগামী প্রয়াস –

দলিত কারা এবং কেন?

দলিত সাহিত্য বিষয়ক আলোচনার সূত্রপাতেই আমরা স্পষ্ট করে দিয়েছি সাধারণত উচ্চবর্গীয় দলিত চেতনায় কারা দলিত। ঋগ্বেদ বলছে-ব্রহ্মা হল সৃষ্টিকর্তা। আদিপুরুষ। ব্রহ্মার মুখমণ্ডল থেকে ব্রাহ্মণের জন্ম। বাহু থেকে ক্ষত্রিয়ের। উরুদেশ থেকে বৈশ্যদের। আর পা থেকে শূদ্রের জন্ম। কারা এই শূদ্র? না, সমাজের নিচে যাদের অবস্থান। অর্থাৎ মাটির সংলগ্ন মানুষেরা।এদের কাজ হলো ফসল উৎপাদন করা। পশুপালন করা। পরিবেশের মৃত গবাদিপশু, শবদেহ বহন করে নিয়ে যাওয়া। ক্ষেতে খামারে মজুরি করা (তখনকার সময়ে বেগার খাটা)। মূলত উপরের তিন শ্রেণিকে সেবা করা। যাদের কখনো কোনো মাটির অধিকার ছিল না। সবাই ছিল অরণ্যচারী। ভিক্ষাজীবী। ছিল না খাদ্যের অধিকার।ছিল না উপার্জনের অধিকার। সুকুমারী ভট্টাচার্যের 'বেদে ক্ষুধা প্রসঙ্গ' গ্রন্থখানিতে আমরা এই নিম্ন শ্রেণির মানুষদের ভাতের জন্য যে হাহাকার তার পরিচয় পেয়েছি।বেদ-এ এদের বলা হচ্ছে অচ্ছ্যুত,অস্পৃশ্য। উপনিবেশবাদের যুগে যাদেরকে বলা হয়েছিল 'সাব-অল্টার্ন'। কথাটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেছিলেন ইতালিয় দার্শনিক আন্তেনিও গ্রামশি (১৮৯১-১৯৩৭) তাঁর 'কারাগারের নোটবই'তে।[১৩] আসলে 'হেগেমনিক শ্রেণি'[১৪] বা 'ডমিন্যান্ট শ্রেণি'র বিপরীত মেরুতে অবস্থিত শোষিত শ্রেণির মানুষদের বোঝানোর জন্য তিনি 'সাব-অল্টার্ন' কথাটি ব্যবহার করেছিলেন। অর্থাৎ 'অধীনস্থ' শ্রেণিকেই তিনি 'সাব-অল্টার্ন' বলেছেন। ইংরেজিতে 'সাব-অলটার্ন' কথাটির অর্থ হলো 'any officer in the British army who is lower in rank than a captain.'[১৫] অর্থাৎ ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে ক্যাপ্টেনের অধঃস্তন অফিসারদের বলা হতো 'সাব-অলটার্ন'। রণজিত গুহ এটির বাংলা প্রতিশব্দ করলেন 'নিম্নবর্গ'। কিন্তু আমাদের বলার বিষয় হলো এই যে, দলিত কারা? অনেকেই বলেন, দলিত তো হলো 'সাব-অলটার্ন'। কথাটি ত্রুটিপূর্ণ। সে দিক থেকে ভারতীয় সমাজ ও ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে 'নিম্নবর্গ' কথাটি অনেকাংশে যুক্তিযুক্ত। গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক তাঁর 'গণতন্ত্রের রহস্য' শীর্ষক গ্রন্থটিতে একটি অমূল্য কথা বলেছেন। 'কারা দলিত?' এই প্রসঙ্গে তা প্রণিধানযোগ্য। উনি বলছেন, 'ওরা (সরকারি নেতারা) SC, ST কথাটাই ব্যবহার করে, এটাই ওদের জানা কথা। কখনো-কখনো OBC আসে হয়তো। কিন্তু ভালো সংস্কৃত কথাটা দলিত- ওদের জানা নেই এখনো'।[১৬]

আবার পৌরাণিক হিন্দু ব্রাহ্মণসমাজ মূলনিবাসী অনার্য ভারতবাসীদের 'রাক্ষস', 'অসুর', 'দৈত্য', 'দাস', 'বানর', 'বেদিয়া', 'ভাল্লুক', 'ভুটিয়া', 'বিরহোড়', 'মাহালি', 'কিরাত', 'শবর', 'নিষাদ' নামে চিহ্নিত করেছিল।[১৭] আবার মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এসে দেখলাম এরাই আবার 'চুয়াড়', 'চন্ডাল', 'কোল', 'মুণ্ডা', 'সাঁওতাল', 'মালো', 'ধোপা', 'চামার', 'বাগদি', 'বাউড়ি', 'মালো', 'মাল', 'ভুঁইমালী', 'রাজবংশী', 'নমঃশূদ্র' প্রভৃতি নামে পরিচিত। সাম্রাজ্যলোলুপ ইংরেজদের চোখে যারা 'ছোটলোক'। সর্বমোট পশ্চিমবঙ্গের দলিত সম্প্রদায়ের সংখ্যা ৬০।[১৮] প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের চোখে এদের একটাই পরিচিতি যে এরা দলিত। এই প্রসঙ্গে ডক্টর প্রথমা রায়মন্ডল জানিয়েছেন, সংবিধান ও মন্ডল কমিশনভুক্ত যাবতীয় 'তপশিলি জাতি' এবং 'আদিবাসী'রা হলো দলিত।[১৯] অবশ্য 'অন্যান্য পশ্চাৎপদ জাতি' (OBC) হিসেবে যারা স্বীকৃত তারাও তাঁর মতে দলিত। তবে সর্বভারতীয় প্রবণতা মেনে সদ্যপ্রয়াত বিখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক সন্তোষ রানা আদিবাসী আর দলিতদের এক পংক্তিতে রাখলেও তপশিলি জাতিদেরকেই তিনি 'দলিত' বলে উল্লেখ করেছেন।[২০] এই দলিত মানুষদের সংখ্যা ভারতের মোট জনসংখ্যার ৮৫ শতাংশ। তবে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ২ কোটি ১৪ লক্ষ দলিততের বসবাস।[২১] ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের দলিতদের সাক্ষরতার হার ৬৯.৪ শতাংশ।[২২] পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, উত্তরবঙ্গের রাজবংশী এবং সুন্দরবনের অঞ্চলের পৌণ্ড্র সম্প্রদায় শাসক শ্রেণি হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে

উত্তর ২৪ পরগনার বঞ্চিত ও শ্রমনির্ভর সম্প্রদায় থেকে নমঃশূদ্ররা রূপান্তরিত হয়েছেন অগ্রগতির সম্ভাবনাময় সমাজে। আবার পশ্চাদপদ সংখ্যালঘু মুসলিম বা খ্রিস্টানরাও 'দলিত' হিসেবে পরিচিত ভারতীয় দৃষ্টিকোণেই।

অর্থাৎ ভারতীয় আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যারা শ্রেণি কিংবা শ্রম, ধর্ম কিংবা রাষ্ট্র কাঠামোর একেবারে তৃণমূল স্তরে অবস্থান করছে; যাদের আত্মোন্নয়নের প্রয়াস অত্যন্ত কঠোর অথচ উচ্চবর্গীয় বিধিবিধানে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে যাদের আত্মমুক্তির সুনিশ্চিত প্রয়াস-তারাই প্রকৃত অথে দলিত। অবদমিত। তবে শরণকুমার লিম্বালের মতো তাত্ত্বিকরা 'দলিত' বলতে শুধু অস্পৃশ্য জাতিকে চিহ্নিত করতে নারাজ। তাঁদের বক্তব্য, অর্থগতভাবে পশ্চাদপদ মানুষকেও দলিতবর্গের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।[২৩] উচ্চবর্গের আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষদের প্রতি দয়াপরবশ হয়েই এই ব্যাখ্যা। অর্থগতভাবে পিছিয়ে থাকলেও বর্তমান রাষ্ট্রিক পরিস্থিতি আমাদের যে শিক্ষা দেয় তাতে দেখি তারা জাত্যাভিমানে অন্ধ। মেধায় পিছিয়ে থাকলেও নামের পদবীর গাম্ভীর্যে নিজের শ্রেণিগত অবস্থানকে ভুলতে পারেন না। সেই বিচারে তাদেরকে যদি দলিতবর্গের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তারা কি দলিতত্বকে মেনে নেবেন? স্বীকৃতি দেবেন কি নিজেকে দলিত হিসেবে?এই জিজ্ঞাসা থেকেই যায়!

আসলে প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগে বর্ণের দিক থেকে যারা শূদ্র; ঔপনিবেশিক যুগে শিক্ষার দিক যারা মূর্খ বলে পরিগণিত হয়ে এসেছে; উত্তর-উপনিবেশিক যুগে অর্থের দিক থেকে যারা দরিদ্র শ্রেণিভুক্ত; কিংবা শ্রমের বিভাজনে যারা চণ্ডাল, ডোম, জেলে, মুটে, রিকশাচালক প্রভৃতি; মার্কসের শ্রেণি-বিভাজন মোতাবেক যারা 'প্রলেতারিয়েত'; সাংখ্যিক ভারত (ডিজিটাল ইন্ডিয়া)-এর পরিসংখ্যানে যাদের পরিচিত 'মানুষ' নয়, সংখ্যামাত্র। 'রক্তকরবী' নাটকে যাদের 'না আছে আকাশ, না আছে অবকাশ'।[২৪] যারা 'রাজার এঁটো'[২৫] তারাই মূলত 'দলিত'।

'দলিত' শব্দ বর্জনের, না অর্জনের?

চন্দ্রা আর বিশু নিজেদের শোষিত জীবনের দুঃখ কষ্ট আদান-প্রদান করেছে। কী নিয়ে তাদের এই আলাপ আলোচনা? না, রাজার সর্দারের কপটচারিতা নিয়ে। চন্দ্রার ভয় সর্দারকে নিয়ে। পাছে যদি শুনে ফেলে। ওদিকে বিশুও সংশয়ান্বিত। তাই আক্ষেপের সুরে বলে ওঠে বিশু, 'বেয়ান, কথা আমরা বলি, মানে যে করে ওরা'।[২৬] কথার এই 'মানে'র দর্শন তা সত্যিই দ্বিধাজড়িত। তাছাড়া 'বক্তা' যেখানে শ্রমজীবী সম্প্রদায় আর 'শ্রোতা' যেখানে মালিকপক্ষ বা রাজা সেখানে সে-কথার যে কোনো গুরুত্ব থাকবে না তা বলাই বাহুল্য। কেননা পুঁজিবাদী সমাজ, প্রভুত্বকারী সমাজ, আধিপত্যকামী সমাজ-অর্থগতভাবে যে-মানুষ উচ্চপর্যায়ে উন্নীত নয়, সে-ব্যক্তিকে যেমন গুরুত্ব দেয় না। তেমনি তার কথাকেও আমল দেয় না। তাইতো দেখি বর্ণকৌলিন্যে নিম্ন শ্রেণিতে অবস্থান করলেও অর্থকৌলিন্যে কেউ যদি উচ্চবর্গের সমীপবর্তী চলে আসে বর্ণবাদী সমাজে তাকে একটু হলেও সৌজন্য প্রকাশ করা হয়। কিন্তু যতদিন 'আমরা'- 'ওরা' বিভেদ ঘুচবে না, ততদিন বৃহদাংশিকদের কোনো 'কথা'র মানে ন্যূনাংশিকদের কাছে সর্বান্তঃকরণে সমর্থিত হবে না।

'দলিত' শব্দের উপরেও নেমে এসেছে সেই একই অভিশাপ। আজ 'দলিত' শব্দ নিয়ে বিতর্কের অন্ত নেই। আজ বাংলায় নয়, ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের পণ্ডিত মহল 'সাহিত্য' হিসেবে যেমন, 'পরিচিতি' হিসেবেও তেমনি এই 'দলিত' শব্দটি ব্যবহারে প্রশ্ন তুলেছেন। এমনকি অস্বীকার করার উপায় নেই, দলিত-বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অনেকেই আছেন নিজেকে 'এলিট' শ্রেণিভুক্ত ভাবতে বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করেন। কিন্তু জন্মসূত্রে যারা দলিত তারা তাদের মানবমনের অন্তঃস্থলে আপন আপন দলিত পরিচিতিকে অস্বীকার করতে পারবে না। যদিও বর্তমান বিচারব্যবস্থা (মাদ্রাজ হাইকোর্ট) 'দলিত' শব্দের ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করে থাকেন। রাষ্ট্রের যুক্তি-'দলিত সংবিধান বহির্ভূত শব্দ। ভারতে সমাজের বঞ্চিত ও শোষিত শ্রেণিকে বর্ণনা করার জন্য যে 'দলিত' শব্দটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে, সেটি প্রয়োগ না-করার জন্য দেশের টিভি চ্যানেলগুলোকে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে'।[২৭] এটি আসলে একটি রাজনৈতিক চক্রান্ত ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। নিম্নবর্গ, তপশিলি জাতি বা উপজাতি, অনগ্রসর শ্রেণি যাই বলা হোক না কেন, 'দলিত' শব্দটি অধিকতর অস্মিতাসূচক। যা নিম্নশ্রেণির মানুষদের আন্তর্জাতিক পরিচিতিকেই দ্যোতিত করে। তাই রাষ্ট্র আইনি সন্ত্রাসের হাড়িকাঠে এভাবে দলিতদের বলি দিতে উদ্যত হয়েছে। এখন এই 'দলিত' শব্দের বিশ্লেষণের পূর্বে আমরা 'দলিত' শব্দকে কেন্দ্র করে

আছে যে সমস্ত পরিচিতিসূচক শব্দ সেগুলি বিশ্লেষণ করব—

প্রথমেই নেওয়া যাক 'শূদ্র' শব্দটি। এটি আর্যভারতের পণ্ডিতরা ব্যবহার করতেন। সংস্কৃত 'শূচ্' ধাতুর 'রক্'(র) প্রত্যয়ে 'চ' দীর্ঘ হয়ে 'দ'-তে রূপান্তরিত হয়ে 'শূদ্র' হয়েছে। 'বঙ্গীয় শব্দকোষ'-এ 'শূদ্র' কথার অর্থ করা হয়েছে- 'নিকৃষ্টত্ব হেতু শোককারী। ঋকবেদের বর্ণচতুষ্টয়ের চতুর্থ বর্ণ। এখন শুধুমাত্র 'শূদ্র' কথাটির মধ্যে আছে শোকের জ্বালা। নিকৃষ্ট হওয়ার আত্মঅবমাননা। আসলে আর্য-অনার্যের যুদ্ধে দুর্বল অনার্যদের স্বজন হারানোর বেদনাতেই এই শোকের উদ্ভব। তাছাড়া আর্যদের দ্বারা শূদ্রদের জল, মাটি, ভূমি ও অন্নের সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত করার কারণেই এই 'নিকৃষ্টত্ব' অনুভব। তাছাড়া 'শূদ্র' কথার আরো একটি অর্থ করা হয়েছে তা হল- 'অবর' (subordinate/subaltern)। কেননা তারা অধঃপতিত (out caste)। অন্য তিন শ্রেণির কেবল সেবা করে যাবে। এই শূদ্ররা আবার চার ভাগে বিভক্ত। যথা- জনজাতি, তপশিলি জাতি, পশ্চাৎপদ শ্রেণি ধর্মান্তরিত এবং নারী।

এখন 'শ্রেণি' প্রসঙ্গে বলা চলে, প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সমাজে শ্রেণিকরণ থাকলেও, শ্রেণিভেদ থাকলে 'শ্রেণি'র বাস্তব ধারণা কিন্তু ছিল না। পরবর্তীকালে মার্কসীয় সাহিত্য অধ্যয়ন করার পর পেলাম 'মালিক' এবং 'শ্রমিক' -এই দুই শ্রেণির অস্তিত্ব। মালিক শ্রেণি হল তারা যাদের প্রাকৃতিক ও জাগতিক সবকিছু সম্পদের উপর মালিকানা ছিল। আর যারা মালিক শ্রেণির অধীনস্থ ছিল তারাই হল শ্রমিক। অতএব শূদ্ররাই হল শ্রমিকশ্রেণি। তাই বৃত্তিগতভাবে 'শূদ্র' শব্দের বর্তমান অর্থ দাঁড়াল শ্রমিক শ্রেণি। আবার বিত্তভেদেও শ্রেণিকরণ হল। 'ধনী' আর 'দরিদ্র' শ্রেণি। শ্রমিকশ্রেণিকে বোঝানোর জন্য বলা হল এরা 'দরিদ্র'। তেমনি আবার বর্ণের ধারণার মধ্যে নিহিত আছে জাতের বিভাজন। উচ্চবর্ণ আর নিম্নবর্ণ। এই নিম্নবর্ণদের আবার সংখ্যালঘু ও সর্বহারা বলেও অভিহিত করা হয়। এখন শূদ্রই বলি বা নিম্নবর্ণ, কিংবা শ্রমিকশ্রেণি বা অবর, কিংবা সর্বহারা কিংবা সংখ্যালঘু-প্রতিটি সেই 'দলিত' শব্দের বহুমাত্রিক পরিচিতি।

তবে 'দলিত' শব্দের মূলে আছে 'দলন ক্রিয়া'। যুগ যুগ ধরে ভারতবর্ষে যাঁরা দলিত হয়ে এসেছেন তাঁরাই দলিত। 'অস্পৃশ্য' (untouchable) অর্থেও 'দলিত' ধরা হয়। ১৯৩২ সালের শুরুতেই অস্পৃশ্যদের বোঝানোর জন্য গান্ধীজী 'হরিজন' শব্দটি ব্যবহার করেন। যার অর্থ 'children of God' বা ঈশ্বরের সন্তান। আসলে নরসিং মেহতান নামে এক গুজরাটি ব্রাহ্মণ তিনি বৈষ্ণবীয় সাধু-কবিদের চিহ্নিতকরণের জন্য প্রথম 'বৈষ্ণবজন' শব্দটি ব্যবহার করেন। অন্যদিকে গান্ধীজীর প্রিয় গ্রন্থ ছিল বৈষ্ণবভাবাপন্ন তুলসীদাসের 'রামচরিতমানস'। যেখানে লক্ষ্মণ ক্ষত্রিয় পরশুরামকে 'হরিজন' আখ্যা দিয়েছেন। 'বৈষ্ণব জন'-এর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে এবং তুলসীদাসের অনুকরণে নিম্নশ্রেণির মানুষদের গান্ধীজীর আখ্যা দিলেন-'হরিজন'।[২৮] আবার ১৯১৬ সাল থেকে ব্রিটিশ সরকার আমলাতান্ত্রিক পরিভাষা হিসেবে নিম্নবর্ণের মানুষদের বোঝাতে 'Depressed classes' বা 'অবদমিত শ্রেণি' হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করল। পরিভাষাটি ১৮৭৭ সালের 'বোম্বে গেজেটিয়ারে' প্রথম ব্যবহৃত হয়। ১৯৩৫ সালে 'ভারত সরকার আইন' (Government of India Act, 1935) কার্যকরী হলে 'Depressed classes' বা 'অবদমিত শ্রেণির' পরিবর্তে 'Scheduled caste' বা 'তপশিলি জাতি' কথাটি প্রচলিত হয়। বর্তমানে এটিই সরকারি ভাষা। কিন্তু ১৯৭২ সালে বোম্বেতে 'দলিত-প্যান্থার' আয়োজিত দলিত সাহিত্য সম্মেলনে 'দলিত' শব্দটিকেই প্রচলনের জন্য বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়। সাফল্যও অর্জিত হয়। অন্যদিকে পশ্চিম ভারতে জ্যোতিবা ফুলে 'দলিত' শব্দটিকে মান্যতা দিয়েছিলেন। অবশ্য তাঁর ব্যবহারের উদ্দেশ্য ছিল সাহিত্যের আখ্যানকে বিন্যস্ত করা এবং তার মধ্যে দিয়ে দলিত উত্থানকে বাস্তবায়িত করা। কিন্তু 'অস্পৃশ্য' বোঝাতে তিনি ব্যবহার করতেন 'অতি-শূদ্র' কথাটি।[২৯] তবে শব্দবিজ্ঞান মোতাবেক 'দলিত' শব্দটির উৎস প্রসঙ্গে ড. কনিষ্ক চৌধুরী দেখিয়েছেন 'দল্লিদা' বা 'দাল্লিদা' শব্দ থেকে 'দলিত' শব্দটি এসেছে।[৩০] 'দাল্লিদা' পালি শব্দ। বৌদ্ধ সাহিত্যের শব্দ। সংস্কৃতে যার অর্থ হল 'দারিদ্র্য'। তবে 'দল্লিদা' বলতে বোঝানো হয়েছে 'সম্পত্তিবান ধনীশ্রেণির বিপরীতে অবস্থিত সম্পত্তিহীন দরিদ্রশ্রেণির মানুষ'। তাই পালি ভাষার 'দল্লিদা-কুল' থেকে বাংলায় 'দলিত শ্রেণি' কথাটির জন্ম হয়েছে বলে মনে হয়। আম্বেদকরও 'হরিজন' শব্দটিকে অস্বীকার করে প্রতিষ্ঠা দেন 'দলিত' শব্দটি। অন্যদিকে মারাঠি অভিধানের 'দলিত' শব্দটির অর্থ করা হয়েছে (ক) 'Ground' বা নিম্ন এবং (খ) 'Broken or pieces generally' অর্থাৎ ভগ্ন বা খন্ড।[৩১]

আবার 'অস্মিতাদর্শ' পত্রিকার সম্পাদক মারাঠি অধ্যাপক গঙ্গাধর পান্তবানে (Gangadhar Pantang) 'দলিত' শব্দের অর্থ অনুসন্ধানে জানিয়েছেন যে, 'দলিত' কোনো জাত নয়। সে একজন মানব। যে ভারতীয় সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ঐতিহ্যের ধারা থেকে বঞ্চিত ও বিতাড়িত। দলিত-মানব কখনো ঈশ্বর, পুনর্জন্ম, আত্মা, খ্রিস্টীয় পবিত্রতার ভাবনা, ভাগ্য এবং স্বর্গের ধারণায় বিশ্বাস রাখে না। সে একমাত্র মানবতাবাদেই আস্থাশীল। 'দলিত' শব্দটি আসলে পরিবর্তন এবং বিপ্লবের প্রতীক'।[৩২] আবার 'Collins English Dictionary'তে 'দলিত' শব্দের যে অর্থ করা হয়েছে তা হল ভারতবর্ষের সর্বনিম্ন শ্রেণি। অন্য তিন শ্রেণি (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য) যাদের ঘৃণা করতো। সেই নিম্নশ্রেণির বিশেষ 'ট্যাবু' (নিম্নশ্রেণিদের এমন একটি সাংস্কৃতিক বা সামাজিক প্রথা বা রীতি যা সাধারণত চালু করতে দেওয়া হয় না)-কে উচ্চবর্গীয়রা হীন বলে মনে করত। এই ট্যাবুগত কারণে তাদের 'অস্পৃশ্য' বলে চিহ্নিত করেছিল।[৩৩] তবে 'The Oxford Sanskrit literature'-এ 'দলিত' শব্দটির ব্যুৎপত্তি প্রসঙ্গে দেখানো হয়েছে 'দলিত' শব্দটি এসেছে সংস্কৃত 'দল্' ধাতু থেকে। যার ইংরেজি অর্থ করা হয়েছে- 'fragment', 'piece', 'par' এবং 'dalana'। আর এই 'dalana' অর্থাৎ 'দলন' শব্দের অর্থ করা হয়েছে 'breaking' অর্থাৎ 'ভগ্ন' এবং 'annihilation to pieces' অর্থাৎ 'খন্ডিত'।[৩৪] অন্যদিকে 'বঙ্গীয় শব্দকোষ'কার-এর মতে, '√দল+ত্ (ক্ত)-র্ম্ম = দলিত'। বিশেষণ পদ এটি। এর অর্থ বিদারিত, খণ্ডিত, নির্জিত, নর্দ্দিত, নিরস্ত, দূরীকৃত, বিনাশিত, ক্ষুণ্ন, পদাহত।[৩৫] অতএব আমরা দেখতে পারি-
সংস্কৃত Dalita`> ইংরেজি Dalana > হিন্দি Dalit > বাংলা দলিত।

এখন উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের এ কথা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, সব দলকের দৃষ্টিতে 'দলিত' শব্দটি 'অপমানকর ও অমর্যাদাকর'।[৩৬] কিন্তু দলিতের দৃষ্টিতে 'দলিত' শব্দটি অস্মিতাসূচক। কেননা, 'দলিত' শব্দের দ্বারা দলিত-আত্মন তার বেদনাকে প্রতীকী ভাষায় বোঝাতে পারে। 'দলিত' শব্দের দ্বারা একটা বিরাট আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করতে পারে।

স্ব-শ্রেণির শক্তিকে সংঘশক্তিতে রূপান্তরিত করার সাহস অর্জন করে, যদি সে 'দলিত' শব্দটি প্রয়োগ করে। তাই 'দলিত' শব্দের নতুন অর্থ বলতে পারি 'বিদ্রোহ'। দলিত-চৈতন্য জাগ্রত হলে সেই 'বিদ্রোহ' থেকে জন্ম নেবে 'বিপ্লব'। ভবিষ্যতের সে-বিপ্লবের নাম হবে 'দলিত বিপ্লব'।

কিন্তু ডক্টর অনিল বিশ্বাসের মতে, 'দলিত' নামটি আত্মমর্যাদার পরিপন্থী। সাহিত্যের আগে দলিত শব্দটি অচল।[৩৭] দলিত অবশ্যই বর্জনীয় এবং সাহিত্যে তার আমদানি স্বভাবতই নিষিদ্ধ। তিনি বরং 'ব্রাত্য' শব্দটিকে মান্যতা দেন। তাঁর মতে 'ব্রাত্য' শব্দে আছে ইতিহাসের স্পর্শ। ব্রাত্য সাহিত্য হবে ব্রাত্যজনের। ব্রাত্যজনের জন্য। কর্মকর্তা হবেন ব্রাত্য। অবশ্য অন্য কোনো লেখকও যোগ দিতে পারেন। আর ব্রাত্য জামানা শুরু হবে ২০০১ সাল থেকে।[৩৮] কিন্তু ডঃ বিশ্বাসের এই মন্তব্যের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। ব্রাত্য সাহিত্য কখনো শুধুমাত্র ব্রাত্যজনের হতেই পারে না। ব্রাত্য শব্দে বৈদিক কৌলীন্য থাকলেও তা কখনোই একটি শ্রেণির পরিচিতিকে আন্তর্জাতিক করে তোলে না। তাছাড়া চর্যাপদের কাল ধরে বিচার করলে দশম-দ্বাদশ শতকই নিম্নবর্গের সাহিত্যিকদের সাহিত্য রচনার কাল। সেখানে ডঃ বিশ্বাস ব্রাত্য জমানার সূচনা নির্দেশক-কাল হিসেবে ২০০১ সালকে নির্ধারণ করেছেন, যা দুর্দান্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ দুঃসাধ্য সিদ্ধান্ত ভিন্ন আর কিছুই নয়।

এমনকি 'ব্রাত্য' শব্দটি পরিহার করে আমরা যদি 'সর্বহারা' শব্দটি গ্রহণ করি; তবুও তো ত্রুটিমুক্ত নয়। একথা ঠিক যে, একমাত্র জেলখানা ছাড়া যাদের আর কিছু হারানোর নেই, সহজ কথায় তারাই 'সর্বহারা'। কিন্তু কোনো সাহিত্যের গোত্রকে চিহ্নিত করতে হলে এমন কিছু শব্দ যোজনা আবশ্যক যার দ্বারা, যে প্রেক্ষণবিন্দুকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট সাহিত্য সৃজিত হয়েছে--সেই ভাষা, সংস্কৃতি, সমাজ রাষ্ট্র, দেশ, কাল, যুগ কিংবা যুগ-প্রতিনিধি স্বরূপ লেখক-সত্তাকে আমরা স্পষ্টত অনুভব করতে পারব। কিন্তু 'সর্বহারা' শব্দের মধ্যে না-আছে কোনো ভাষাগত বোধ; না-আছে স্বতন্ত্র কোনো জাতি-ধর্ম-বর্ণ পরিচয়। না-আছে দৈশিক, কালিক ও ভৌগোলিক প্রতিবেশের ধারণা। বিশ্বব্যাপী যেকোনো দেশের, যেকোনো কালের শোষিত, দলিত মানবাত্মাকে অভিহিত করা যায় মাত্র 'সর্বহারা' শব্দ দিয়ে। তাই 'সর্বহারা' শব্দটিকেও 'দলিত' শব্দের পরিপূরক বলা সর্বাংশে যুক্তিযুক্ত হবে না।

আমরা জানি আম্বেদকর তাঁর 'বর্ণ-জাতের বিনাশ' (অ্যানিহিলেশন অফ কাস্ট) গ্রন্থে 'দলিত' বোঝাতে 'Depressed Classes' কথাটি ব্যবহার করেছেন। অনেকে বলেছেন 'Oppressed' শব্দটি। এমনকি নমশূদ্র নেতা গুরুচাঁদ ঠাকুরও 'দলিত পতিত' শব্দটিকেই ব্যবহার করেন। শুধু তাই নয় রবীন্দ্রনাথও সেই পথে হেঁটেছেন। গীতাঞ্জলির ১০৮ সংখ্যক কবিতায় লিখেছেন-

"চরণে দলিত হয়ে
ধূলায় সে যায় বয়ে
সেই নিম্নে নেমে এসো নহিলে নাহিরে পরিত্রাণ
অপমানে হতে হবে আজি তোরে সবার সমান।"[৩৯]

অবশ্য রবীন্দ্রনাথ-ব্যবহৃত 'দলিত' শব্দটি 'বিশেষণ' অর্থে প্রযোজ্য। তবুও এই 'দলিত' শব্দের মধ্যে দিয়ে বর্ণক্রোধী ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজ ও সভ্যতার প্রতি যেমন তীব্র বিষোদগার করেন, তেমনি দলিত-মানবের আত্মআবিষ্কার ও আত্মপ্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে আরও সুদৃঢ় করেন। 'দলিত-আমি' কে প্রত্যয়দীপ্ত কণ্ঠে উদঘোষণের ইঙ্গিত দেন। এমনকি মান্যবর কাঁশীরামজীও যে সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তার জন্য গঠন করেছিলেন 'দলিত শোষিত সমাজ সংঘর্ষ সমিতি'। এমনকি ১৯৭০-এর দশকে মহারাষ্ট্রের 'দলিত-প্যান্থার' আন্দোলনের সমর্থকরা 'দলিত' শব্দটিকেই বেশি ব্যবহার করেছেন।

কিন্তু 'দলিত' শব্দটি মারাঠা, গুজরাট, তামিল, কন্নড় প্রভৃতি স্থানে বহুল প্রচলিত হলেও, আমাদের পশ্চিমবঙ্গে এই শব্দের প্রচলন খুবই কম। তাছাড়া 'কেন্দ্রীয় তপশিলি জাতি কমিশন' স্ব-শ্রেণির একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান, তারাও 'দলিত' শব্দ ব্যবহারে আপত্তি জানায়। কিন্তু আইনি-সন্ত্রাসের ভয় দেখিয়ে যেমন মানুষের মন থেকে কখনো বর্ণক্রোধ, জাতক্রোধ, বংশকৌলিন্য, হীনমনোবৃত্তিকে দূর করা যায় না, তেমনি আইনের সহায়তায় কখনো পুরোপুরিভাবে দলিতরা তার হারানো সম্মান ফিরে পেতে পারে না। সার্বিক দলন ক্রিয়া ও দলনপ্রক্রিয়া থেকে নিজেকে মুক্ত করতে হলে বর্ণঘৃণার অপমানভার ঘোচাতে হলে উচ্চবর্গীয়দের নিষেধের লক্ষ্মণরেখা অতিক্রমণের জন্য প্রয়োজন নিম্নবর্গের আন্তর্জাতিক পরিচিতি সূচক শব্দ। আর সেটি হল 'দলিত'।

'দলিত' শব্দের স্বীকৃতির যৌক্তিকতা কী?

(১) দলিত শব্দটি নিম্নবর্ণের মানুষদের আন্দোলনের প্রধান হাতিয়ার।

(২) দলিত শব্দ অস্মিতাবাচক।

(৩) কোনো আন্দোলনকে সার্থক হয়ে উঠতে হলে প্রয়োজন আত্মসচেতনতা। দলিত সেই আত্মসচেতনতা জাগরূক শব্দ।

(৪) দলিত শব্দটি আমেরিকার নিগ্রোদের মতো একটি অস্তিত্ববাচক শব্দ।

(৫) দলিত শব্দটি আসলে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার দৃষ্টিকোণে গড়ে উঠেছে। তাই মনুবাদী সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রধান অস্ত্র হল এই দলিত শব্দ।

(৬) দলিত শব্দটি রামস্বামী পেরিয়ার-এর 'self-respect Movement' বা আত্মসম্মান আন্দোলনকে আরো শক্তিশালী করে তোলে।

(৭) দলিত আন্তর্জাতিক পরিচিতি মূলক শব্দ।

(৮) দলিত কথাটি নিছক নিম্নবর্গ বা দরিদ্র নয়। একটি অবদমিত অবস্থাকে বোঝাতে তাই শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

(৯) দলিতের বীক্ষণে শব্দটি কখনো অবমাননাকর নয়। নঞর্থক নয়। আত্মসম্মান বৃদ্ধি করে এমন শব্দ। আপদমস্তক ইতিবাচক। কেননা অবহেলিতদের ঘৃণিত জীবনকে তুলে ধরলেও পরিণতিতে এক মানব সত্যের জগতে উত্তরণ ঘটায়।

(১০) দলিত শব্দ যতটা না প্রণোদিত ও প্ররোচিত করে, তার থেকে বেশি প্রবুদ্ধ করে।

(১১) দলিত শব্দের শক্তি এখানে যে, এই শব্দের ধর্ম হল-গড়ার জন্যই ভাঙ্গা; ভাঙার জন্য গড়া নয়।

(১২) ললিত সাহিত্যের বিপরীত সাহিত্য হল দলিত সাহিত্য।

(১৩) দলিত শব্দের এক বিশেষ প্রতিবাদিতা ও উদ্দেশ্যমুখিনতা বিদ্যমান।

(১৪) দলিত মানুষদের লিখিত সাহিত্য ধারাকে বোঝানোর জন্য সাহিত্যের পূর্বে দলিত শব্দটিই যুক্তিযুক্ত।

কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয়, পরিসংখ্যান বলছে পশ্চিমবঙ্গের বাংলা 'আনন্দবাজার পত্রিকা' এবং বিহারের 'হিন্দুস্থান' হিন্দি পত্রিকা সর্বাধিক বিক্রিত দুটি দৈনিক। দেখা গেছে ৩০ দিনে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' 'দলিত' শব্দটি মাত্র পাঁচ বার ব্যবহার করেছে। সেখানে হিন্দুস্থান পত্রিকায় ব্যবহৃত হয়েছে দেড়শোর বেশি বার।[৪০] এর কারণ কি শাসন ক্ষমতার কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত উচ্চবর্গের সজ্ঞান উদাসীনতা? না, স্বেচ্ছাকৃত বিস্মরণ? না কি উল্টোরথের পালা সূচিত হওয়ার ভয়? না কি 'ওরা' কোনোদিন 'আমরা' হয়ে উঠে 'আমি'র অধিকার দাবি করে বসে সেই ভয়? নাকি 'তুই' কোনোদিন 'আপনি' হয়ে উঠে অহংকারের সিংহাসনে ক্ষয়রোগ ধরিয়ে দেয় সেই ভয়? আর এই ভয় থেকে পরিত্রাণের জন্য বর্তমানে প্রভুত্বকামী উচ্চবর্গরা, দলিত হিসেবে পরিগণিত 'SC' এর পুরো অর্থ 'সিডিউল কাস্ট' শব্দটির সংক্ষিপ্ত রূপকে বিকৃত করে কদর্য ভাষায় আত্মসম্মান-হানিকর 'সোনার চাঁদ' শব্দে পরিণত করেছে। এর জন্য দায়ী অনেকাংশ দলিতরাই। তারা সুযোগ করে দিচ্ছে। তাই 'দলিত' শব্দ কখনই আপত্তিকর, অপমানকর, বর্জনীয় শব্দ হতে পারেনা। সেকারণেই এই শব্দটিকে অধিক জনপ্রিয় ও বিপ্লবাত্মক করে তোলার জন্য সাম্প্রতিক বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সেই প্রয়াস সূচিত হলেও সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক আলোড়ন ও আন্দোলনের ক্ষীণ প্রয়াসকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করা অসম্ভব।

দলিত সাহিত্য জিজ্ঞাসা :

"চাই না আমি
তোমাদের আকাশ থেকে সূর্য আর চাঁদ,
... ...
বা, এমনকি, যে ভালোবাসা তোমরা পাও মা-বোন-মেয়ের কাছ থেকে
চাই না তা-ও,
আমি শুধু চাই
মানুষের অধিকার।
... ...
আমি চাই নিজের অধিকার, আমার অধিকার ফিরিয়ে দাও তোমরা।
নিজেদের কৃতকর্ম কি এভাবে অস্বীকার করা যায়?
রেললাইনের মতো উপড়ে ফেলব আমি এইসব শাস্ত্র কথা
তোমাদের অন্যায় নীতিগুলোকে জ্বালিয়ে দেব, যেভাবে জ্বালিয়ে
দেওয়া হয় বাস
প্রিয় বন্ধুরা আমার!
আমাদের সব দাবী, পূব আকাশে দেখা দিল, ওই দেখো,সূর্যের দীপ্তিতে
বল, এই সূর্যোদয়, কি অস্বীকার করা যায়।"[৪১]

আর অহংসর্বস্ব বর্ণক্রোধী জাত্যান্ধ উচ্চবর্গের বজ্রশাসন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য যে-সাহিত্যের জন্ম সেই সাহিত্যই হল দলিত সাহিত্য। কিম্বা দলিত মানবের কলমে জন্ম যে-সাহিত্যের মধ্য দিয়ে বেদনা-মথিত দলিত-আত্মন তাঁর স্বাধিকার অর্জনের লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন সে-সাহিত্যই দলিত সাহিত্য। তাছাড়া যে সাহিত্য ব্রাহ্মণ্য ভাবধারা-পুষ্ট সংস্কৃতি, পরমেশ্বর কেন্দ্রিক ঐতিহ্য চেতনা এবং ধর্মনির্ভর মূলধারার সাহিত্য ভাবনাকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে সেই-সাহিত্য দলিত

সাহিত্য।

কিংবা যে-সাহিত্য বর্ণবাদী প্রতিহিংসাপরায়ণ দলক গোষ্ঠীর দলন প্রক্রিয়ার শৃঙ্খলের বেড়ী ছিন্ন করে; পীড়িত ও অবহেলিতদের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করে থাকে; পদদলিতদের মানবতার উচ্চাদর্শে উন্নীত করে; এমনকি দলিত মানবের জাতীয় ঐক্য উজ্জীবনের আন্দোলনে বিদ্রোহের ইতিহাস হয়ে ওঠে যে-সাহিত্য সেই সাহিত্যই হল দলিত সাহিত্য। দলিতত্ব থেকে মুক্তির সাহিত্য।

আবির্ভাব :

মহারাষ্ট্রেই সর্বপ্রথম দলিত সাহিত্যের জন্ম। অবশ্য তা একান্তভাবেই মহারাষ্ট্রের প্রথম প্রজন্ম-শিক্ষিত বা সৃজনশীল দলিত মানুষদের, অচ্ছুৎ মানুষদের কলমে সৃষ্ট। এমনকি সে-সাহিত্যে দলিতদেরই দুঃখ-যন্ত্রণা, লাঞ্ছনা-বঞ্চনা, না-পাওয়া, না-খাওয়া, হারানো, হেরে-যাওয়া, হারিয়ে-যাওয়া কিম্বা হারিয়ে-পাওয়ার কথা ও কাহিনি বর্ণিত হল। কিন্তু সাহিত্যের তো বাস্তব ভিত্তি আছে। আছে উদ্দেশ্যমুখইনতাও। তাই মারাঠীদের রচিত সেই সাহিত্যধারাকে বিশ্বসমক্ষে চিহ্নিতকরণের জন্য 'সাহিত্য' শব্দের পূর্বে যুক্ত করানো-আত্মপরিচিতিসূচক নাম 'দলিত'। গড়ে উঠল দলিত সাহিত্য। আজ যা সমগ্র বিশ্বব্যাপী প্রসারলাভ করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ড. শিশির কুমার দাশ তাঁর 'A History of Indian Literature' গ্রন্থে জানিয়েছেন, আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের প্রেক্ষাপটে দলিত সাহিত্য একটি ক্রান্তিকারী আন্দোলন। সামাজিকভাবে যারা অবহেলিত ও পদদলিত তাঁরা 'দলিত' শব্দটির মধ্যে দিয়ে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার স্বরূপকে তাৎপর্যমণ্ডিত করে তোলেন। দলিত আন্দোলন গান্ধীবাদী কিংবা নারায়ণ গুরুর মতাদর্শভিত্তিক আন্দোলন থেকে ভিন্ন। মূলত ব্রাহ্মন্যবাদী সংস্কারকে বিরোধিতা করে দলিত সংস্কৃতিকে তুলে ধরাই এর মূল লক্ষ্য। ১৯২৭ সালের ২৯ ডিসেম্বর আম্বেদকরের ' মনুস্মৃতি 'পোড়ানোর দিন থেকেই দলিত ভাবনা ও দলিত সাহিত্যের জন্ম।[৪২]

হয়ে-ওঠার বিবর্তন :

তবে আজ যে সাহিত্যকে আমরা দলিত সাহিত্য বলে চিনছি তা অনেক বিবর্তিত রূপের ফসল। বিবর্তন কালের অমোঘ নিয়ম। সাহিত্যও কখনো কালাতীত নয়, কালানুগ। একদা যে-দলিত সাহিত্যের জন্মই হয়েছিল বর্ণহিন্দুর সৃষ্ট অস্পৃশ্যতার বিরোধিতা করার জন্য। বলা ভালো একটা হীনমন্যতাবোধ প্রত্যক্ষভাবে না হোক পরোক্ষভাবে ছিলই সেই সাহিত্যে। অবশ্য তা প্রথমঅবস্থায় ছিল মূলত মনুসংহিতার প্রতিবাদস্বরূপ সাহিত্য সৃজনের প্রয়াস। পুরোহিততন্ত্রের অভ্যন্তরীণ সংস্কারের বিরোধিতা করার অভিপ্রায়। ছিল সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার আদায়ের জন্য এক বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা। দলিত সাহিত্যই ছিল এর প্রধান হাতিয়ার। এও একধরনের শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন। যার তীরের ফলা গিয়ে উদ্যত হয়েছিল ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যের দিকে। প্রতিষ্ঠান-বিরোধী আন্দোলন বললেও অত্যুক্তি হবে না। কেননা সে প্রতিষ্ঠান তো আসলে রাষ্ট্র, আইন, ক্ষমতা, ব্রাহ্মণ্যবাদ। তবে যে ব্যক্তিত্ব এই দলিত সাহিত্য রচনার ধারাকে আন্দোলনে রূপ দিলেন তিনি হলেন-বি. আর. আম্বেদকর। আজ তিনি নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছেন। সর্বপ্রথম আম্বেদকরই 'ঈশ্বর-সৃষ্ট জাত ব্যবস্থার' (God made caste system) বিরোধিতার জন্য দলিত আন্দোলনের ডাক দেন।

তবে আমরা যদি এই দলিত সাহিত্য আন্দোলনের উৎস-মুখ অনুসন্ধান করি তাহলে ভিন্ন ভিন্ন মতের সম্মুখীন হব। দেবেশ রায়ের 'দলিত' সংকলনটিতে অর্জুন ডাঙলে এ বিষয়ে যা জানিয়েছেন তা সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করলে দাঁড়ায়—

(১) চতুর্দশ শতকের সন্ন্যাসী কবি চোখামেলা দলিত আন্দোলনের সূত্রপাত করেন।

(২) 'গুলামগিরি' গ্রন্থের লেখক মহাত্মা ফুলে (১৮২৮-১৮৯০)-ও দলিত সাহিত্য আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ।

(৩) কারো মতে এস. এম. মাটে (১৮৮৬-১৯৫৭) ও দলিত সাহিত্য আন্দোলনের সূত্রপাত করেন।[৪৩]

বেড়ে ওঠা :

এখন এই পথিকৃৎগণের দেখানো পথেই দলিত সাহিত্যের পথচলা। ধীরে ধীরে মারাঠা থেকে কন্নড়, গুজরাট, পাঞ্জাব, তামিলনাড়ু প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষা-প্রদেশে দলিত সাহিত্য বিস্তার লাভ করেছে। এর ফলে দেখা যায় দলিত সাহিত্য আন্দোলন ক্রমশ রাজনৈতিক কর্মসূচির সঙ্গে মিশে গেছে। রাজনৈতিক অধিকারের বিষয় প্রাধান্য পেয়ত থাকে দলিত সাহিত্যের আখ্যানে। দলিত সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষিত, মধ্যশিক্ষিত উচ্চশিক্ষিতের পরিসংখ্যানও বৃদ্ধি পায়। এই সময় ১৯৫৬ সালের ১৪ অক্টোবর আম্বেদকর বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। জন্মসূত্রে প্রাপ্ত ধর্মের প্রাচীর ভেঙে স্বনির্বাচিত ধর্মকেই আন্দোলনের হাতিয়ার করলেন। ধর্মের প্রয়োজনে রাজনীতি নয়; রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের লড়াইকে সুগম করতে ধর্মকেই কাজে লাগালেন তিনি। প্রচার করলেন অস্পৃশ্যদের একটাই ধর্ম বৌদ্ধধর্ম। বিরোধিতা করলেন রামরাজ্যের কল্পনার বিরুদ্ধে। তৈরি করলেন রামায়ণ-মহাভারত ও পুরাণের কল্পনা, কাব্য ও যুক্তির বিরুদ্ধে 'এক বিপরীত এপিক ও বিপরীত পূরাণ'।[৪৪]

এখানে একটা বিষয় উত্থাপন করা খুবই জরুরি তা হল দলিতদের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ নিয়ে নিজেদের মধ্যে স্পষ্ট দুটি বিভাজন গড়ে ওঠা। একটি ভাগ বৌদ্ধিক দলিত। যারা নিজেদের 'দলিত' পরিচিতিকে নেপথ্যে রেখে 'বৌদ্ধ' হিসেবে পরিচয় দিতে শুরু করলেন। আর একটি ভাগ হলো অ-বৌদ্ধিক দলিত। এঁরা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেননি। দলিত পরিচিতিকে স্বীকৃতি দিলেন। সমস্যাটি এইখানেই। স্বশ্রেণির ভেদাভেদের দরুণ দলিত সাহিত্য আন্দোলন কিছুটা হলেও ব্যাহত হল। কেননা, এটাতো তো পরিষ্কার যে, সব দলিতরা তো আর বৌদ্ধ নয়। বৃহত্তর দলিতদের একটি ক্ষুদ্র অংশই বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। এখন এই ধর্মান্তরিত বৌদ্ধরাই ধর্মান্তরিত ও অধর্মান্তরিত সকল দলিতকেই বৌদ্ধ হিসেবে পরিচয় দিতে শুরু করে। যুক্তি কি? না বৌদ্ধধর্মের প্রসার ব্যাপক। বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্ম ও চিরাচরিত সংস্কারের বিরোধী। এই ধর্মকে আশ্রয় করে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লে দলিত সাহিত্য আন্দোলনের মৌল আদর্শ-স্বাধিকার অর্জন- তা সহজলভ্য হবে। এটিই ছিল সেদিনের ভ্রান্ত ধারণা। এ প্রসঙ্গে দেবী চ্যাটার্জির যুক্তি- 'দলিতদের বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করাটা ভাল (এটা ভালও হতে পারে আবার নাও পারে) তাহলেও যারা বৌদ্ধধর্ম গ্রহন করেনি তাদের বৌদ্ধ হিসেবে চিহ্নিত করাটা তথ্যগতভাবে ভুল'।[৪৫]

এই ভুল শুধরে নিয়ে পরবর্তীতে দলিত সাহিত্য আন্দোলন আরো জোরালো হয়ে ওঠে। আম্বেদকরের মৃত্যুর পর ১৯৫৬ থেকেই দলিত সাহিত্যের দ্রুত প্রসার ঘটল। এর কারণ হিসেবে বলা যায় কোনো যুগন্ধর ব্যক্তিত্বের তিরোভাবের পরেই তাঁর চিন্তা-চেতনা সাধারণ মানুষের মনে অধিকতর প্রভাব ফেলে। দলিতদের পক্ষেও তাই হয়। সাংস্কৃতিক বা সাহিত্যিক উত্তরাধিকার হিসেবে তখন তাঁরা আম্বেদকরকে গ্রহণ করে থাকেন। দলিত সাহিত্যিকগণ নিজেদের 'আম্বেদকর পন্থী'[৪৬] বলে ঘোষণা করতে শুরু করেন। উল্লেখ্য ১৯৬৭ সালে ঔরঙ্গবাদ থেকে গদাধর পান্তাবানে 'অস্মিতাদর্শ' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করলে, সেটিই হয়ে ওঠে 'দলিত সাহিত্যের মুখপত্র'।[৪৭]

যাইহোক দলিত সাহিত্য এবার 'আত্মোন্নতি' ও 'আত্মপ্রতিষ্ঠার' কথা উচ্চস্বরে বলতে শুরু করল। মারাঠি দলিত সাহিত্যের দয়া পাওয়ার, যশোবন্ত মনোহর, নামদেও ধাসাল; শরণকুমার লিম্বালে, বাবুরাও বাগুল, অর্জুন ডাঙলে প্রমুখেরা মূলত চতুরাশ্রম এবং শ্রেণি শোষণের বিরুদ্ধে কলম ধরলেন। এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ্য শরণকুমার লিম্বালের 'বেজন্মা' উপন্যাস, দয়া পাওয়ারের 'কোন্ডওয়াড়া' (১৯৭৪) কাব্যগ্রন্থ, অর্জুন ডাঙলের 'শাওনি হিলতে আয়' প্রভৃতি রচনা উল্লেখযোগ্য।

এদিকে কন্নড় প্রদেশে মাথা চাঁড়া দিয়ে ওঠে 'বান্ডাইয়া আন্দোলন'।[৪৮] এই আন্দোলন কন্নড় দলিত সাহিত্য আন্দোলনকে আরোও শক্তিশালী করে। সামাজিক অন্যায়, অবিচার, উৎপীড়ন ও শোষণের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলাই ছিল কন্নড় দলিত সাহিত্যের প্রধান উদ্দেশ্য। কন্নড় ভাষা-সাহিত্যের অধ্যাপক-কবি সিদ্ধালিঙ্গাইয়া, মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও প্রাবন্ধিক ডা.অরবিন্দ মালাগাট্টি, দেবানুর মহাদেবা, গীতা নাগভূষণ প্রমুখ ছিলেন কন্নড় দলিত সাহিত্যের পথিকৃৎ। তেমনি আবার নীরব প্যাটেল, মঙ্গল রাঠোড়, যশোবন্ত বাঘেলা, জয়ন্ত পারমার প্রমূখ সাহিত্যিকগণ গুজরাটি দলিত সাহিত্যের প্রবাহকে আরোও পুষ্ট করেন। আবার 'দলিত আইডেন্টিটি'কে সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে ঘোষণা করার লক্ষ্যে, এবং কলমের কাজকে আন্দোলনের কাজ হিসেবে গড়ে তুলতে এগিয়ে আসলেন প্রেম গোর্খী, লাল সিং দিল,

সোহন সিং, নানক সিং, যশবন্ত সিং, কর্তার সিং দুগ্গাল, সুরিন্দর সিং নরুলা, ভগবন্ত রসুলপুরী প্রমূখ পাঞ্জাবি সাহিত্যিকগণ। এরপর আশির শেষ ও নব্বইয়ের দশকের শুরুর দিকে দলিত আন্দোলনে ইন্ধন যোগাল তামিল দলিত সাহিত্য। মূলত 'সংরক্ষণ' নিয়ে মণ্ডল কমিশনের বিরুদ্ধে নানা রাজনৈতিক কার্যকলাপ শুরু হওয়ায় তার বিরোধিতা করা; আম্বেদকর রচনাবলী তামিল ভাষায় অনূদিত হওয়া এবং মার্কসবাদী সমাজ ও সংস্কৃতি পরিবর্তনের জন্যই মূলত তামিল সাহিত্যের আবির্ভাব। সুন্দরমূর্তি, নান্দান, কান্নাপান, পূমণি প্রমূখ হলেন তামিল দলিত সাহিত্যের অগ্র-পথিক।

এই ভাবে দলিত সাহিত্য সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে বর্ণ-বৈভাজনিক সমাজব্যবস্থাকে ভাঙার এক মহান আন্দোলনের আকার দান করে। যার প্রভাবে বাংলা দলিত সাহিত্যের প্রসার ঘটে।

কেন দলিত সাহিত্য?

সাহিত্য আবার দলিত হয় না কি? দলিত সাহিত্যের কি কোনো অস্তিত্ব আছে? দলিতদের সাহিত্য রচনার কোনো বোধ আছে কি? সাহিত্য সাহিত্য। তা দলিত কিম্বা অদলিত এসব নামে চিহ্নিত করার কি কোনো যুক্তি আছে? কারা লেখেন দলিত সাহিত্য? এখন একটা বিষয় ভাববার যে, এসব প্রশ্ন করছেন কারা? আধিপত্যবাদী বুদ্ধি-ব্যবসায়ী সমাজ। এঁরাই কি সাহিত্যের বিচারক? এ তো আসলে পুকুরের তীরে দাঁড়িয়ে পুকুরের গভীরতা পরিমাপ করার ব্যাপার। এ-তো উপর থেকে নীচের তলায় চোখ রেখে নীচের মানুষদের গতিবিধি লক্ষকরা। অর্থাৎ দলকের অভিজ্ঞতায় দলিতকে দেখা। ব্রাহ্মণ্য ভাবধারায় পুষ্ট সাহিত্যের বিচারে দলিত সাহিত্যকে বিচার। অনেকে বলবেন 'দলিত-কনসাসনেস' বা 'দলিত-চেতনা' নিয়ে যদি কোনো অ-দলিত দলিত সাহিত্যকে বিচার করে তাহলে প্রশ্ন উঠবে কেন? তাঁরা তাঁদের যুক্তির সপক্ষে হাজির করবেন ড. অরবিন্দ মালাগাট্টিকে। তিনি বলবেন-

> "দলিতরা দলিত সাহিত্য লিখছেন, এটা স্বাভাবিক। অদলিতেরা দলিত সাহিত্য লিখছেন কখনো কখনো; কিন্তু তাদের থাকতে হয় সঠিক 'দলিত কনসাসনেস।"[৪৯]

কিন্তু এই 'চেতনা' (consciousness) আসে 'জানা' (knowledge) থেকে। আবার এই জানা দুই প্রকার। এক. অনুমানে জানা অর্থাৎ বুদ্ধিতে জানা। দুই. অনুভবে জানা, অর্থাৎ ভাবে জানা। অনুমানে বা বুদ্ধিতে জানি 'বিষয়'কে বা 'বস্তু'কে। কিন্তু ভাবে বা অনুভবে জানি 'বিষয়ী'কে বা 'ব্যক্তি'কে। তাই যে-ব্যক্তি দলন-প্রক্রিয়ার শিকার হননি; বর্ণক্রোধের আগুনে যার মন পোড়েনি; সেই-ব্যক্তির দলিতত্বের বোধ বা দলিত চেতনা কীভাবে অনুভব্য হয়ে ওঠে সে-বিষয়ে জিজ্ঞাসা চিহ্ন থেকেই যায়। নিজে দেখা আর অন্যকে দেখানো-র ক্ষেত্র দুটি পুরোপুরি আলাদা। 'আমি দেখি'-এর মধ্যে 'মমত্বই' মুখ্য। কিন্তু যদি বলি, 'আমি দেখাই' তখন 'কর্তৃত্ব'ই মুখ্য। রঙিন কাঁচ দিয়ে দেখার মতো। কাচের পরিবর্তে কাঠ দিলে লক্ষ্য বস্তু অদৃশ্যের অন্ধকারে হারিয়ে যাবে। দেখার মধ্যে তাই কোনো অহংতা থাকে না। কিন্তু দেখানোর ক্রিয়া সম্পূর্ন অহংসর্বস্ব। কর্তা এখানে প্রয়োজক। 'বিষয়ী'কে জানা যেন সেখানে উপলক্ষ মাত্র। লক্ষ্য হল 'অহং' অর্থাৎ 'দম্ভ'। দলিতের দলিত-চেতনা আর অ-দলিতের দলিত-চেতনার পার্থক্য এখানেই। দলিতের দলিত চেতনায় 'মমত্ব'ই আসল। কেননা সে-চেতনা নিজেই নিজে পূর্ণ। বৃত্তের মধ্যে থেকেই নিজেকে অনুসন্ধান করে থাকে। একসময় বৃত্তের শৃঙ্খল ছিন্ন করে মানবত্বের অসীমতায় উত্তরণ ঘটায়। কিন্তু অ-দলিতের দলিত-চেতনা হলো একটি বৃত্তের কেন্দ্রে ও বৃত্তের উচ্চাসনে অবস্থান ক'রে অপর কোনো বৃত্তের পরিধি বরাবর বিচার করার শক্তি। এ শক্তি অসম্পূর্ণ। বাইরে থেকে দেখা। জন্ম-দলিতই দলিত মানসিকতাকে পূর্ণভাবে অর্জন করার ক্ষমতা ও যোগ্যতা দুইই রাখে। তাই দলিত ভিন্ন অন্যদের দলিত মানসিকতাকে অর্জন করতে হলে 'আপন' হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়াতে হবে। দলিতের জীবন, সমাজ ও সংস্কৃতিকে উচ্চবর্গীয় দৃষ্টিকোণে দেখলে চলবে না। বিশ্লেষণ করতে হবে দলিত মানসিকতার বোধে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'পশ্চিমবঙ্গ দলিত সাহিত্য সংস্থা'র সভাপতি থাকাকালীন অধ্যাপক ড.অচিন্ত্য বিশ্বাস 'ঐক্যতান-গবেষণা সংসদের' পক্ষ থেকে আয়োজিত ১৯৯৬ সালের ৩ আগস্ট 'দলিত সাহিত্য : একটি বিতর্ক' শীর্ষক আলোচনা সভায় যুক্তি দেখিয়েছিলেন-

> "দলিতের রক্তে যে শোষণ লাঞ্ছনার অভিজ্ঞতা তার যে অনুভব তা দূর থেকে আংশিক বোঝা যায়, সম্পূর্ণভাবে সম্ভব নয় -তাই দলিতের দ্বারাই যথার্থ দলিত সাহিত্য হতে পারে।"[৫০]

উক্ত সভায় ড.দীনেশ ডাকুয়া বলেন যে, 'প্রগতি সাহিত্যের সহোদর হতে পারে দলিত সাহিত্য'।[৫১] এক্ষেত্রেও তাঁর সংশয় থেকে গেছে। কেননা 'হতে পারে' বিষয়টি লক্ষণীয়। অন্যদিকে অনিল বিশ্বাসের মতো বিজ্ঞ মানুষ দলিত সাহিত্যকে অস্বীকার করেন। কিংবা সুধী প্রধান মার্কসীয় দৃষ্টিকোণে প্রগতি সাহিত্য হিসাবেই দলিত সাহিত্যকে বিচার করেন। সেই সঙ্গে আর একটি প্রশ্ন উঠল প্রগতি সাহিত্য কিংবা প্রতিবাদী সাহিত্যের সঙ্গে দলিত সাহিত্যের কোথায় ফারাক? এমনকি অধ্যাপিকা ভারতী রায়ও গণশক্তি পত্রিকায় অর্জুন ডাঙলের 'পয়জনড্ ব্রেড' গ্রন্থ সমালোচনার সূত্রে মন্তব্য করেন, দলিত সাহিত্যের অপর নাম প্রতিবাদী সাহিত্য।[৫২]

প্রতিবাদ সাহিত্যের ধর্ম। তা সে দলিত হোক আর প্রগতি সাহিত্য যাই হোক না কেন। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে কিসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ? কার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ? উত্তরে বলা যায়, এই প্রতিবাদ কোনো ব্যক্তি বা কোনো গোষ্ঠী বা কোনো জাতি বা জাত কিংবা কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নয়। নয় কোনো চিরন্তন বিশ্বাসের প্রতি। এ-প্রতিবাদ আসলে অ-সত্যের প্রতি। অমানবিকতার প্রতি। তাই প্রতিবাদ তো সব সাহিত্যেই কমবেশি আছে। সে বিচারে দলিত সাহিত্যও প্রতিবাদিতা বর্তমান। কিন্তু নিছক 'প্রতিবাদী সাহিত্যে'র তকমা দিয়ে দলিত সাহিত্যের উদ্দেশ্যকে খর্ব করা উচিত নয়। কেননা উচ্চবর্গীয় সমাজব্যবস্থার হীনমনোবৃত্তির প্রতি প্রতিবাদ করাই দলিত সাহিত্যের কাজ। যে জাত-পাত ব্যবস্থা ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় মানবিক পরিস্থিতিকে সংকটাপন্ন করে তুলেছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করাই দলিত সাহিত্যের অন্যতম লক্ষ্য। এই প্রতিবাদের জন্ম আসলে মানুষ হয়ে মানুষের দ্বারা দলিত, অপমানিত হওয়ার জন্য। মানুষ হয়ে মানুষের সম্মান না পাওয়ার জন্য দলিত সাহিত্যের প্রতিবাদ। সুতরাং বলা যেতে পারে, সব সাহিত্যই প্রতিবাদী সাহিত্য, কিন্তু সব প্রতিবাদী সাহিত্যই দলিত সাহিত্য নয়।

এক্ষেত্রে প্রগতি সাহিত্যের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। 'প্রগতি' কথার অর্থ 'ক্রমশ উন্নতি'। ধ্রুব লক্ষ্যে পৌঁছানো। উত্তরোত্তর 'ভালো'র দিকে এগিয়ে যাওয়া। অগ্রণী চেতনার বোধে উৎকৃষ্ট সৃজনশীলতার লক্ষ্যে উত্তীর্ণ হওয়া। মার্কসবাদী চেতনায় প্রগতি সাহিত্যের জন্ম ১৯৩০-এর দশকে।[৫৩] প্রগতি সাহিত্যের লক্ষ্য কল্পনা-বিলাসের বিরুদ্ধে বাস্তবকে তুলে ধরা এবং আধ্যাত্মিকতার বিরুদ্ধে যুক্তিবাদকে প্রতিষ্ঠা ধরা। এ-প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, প্রগতি সাহিত্য আসলে শ্রেণি-সংগ্রামের বিরুদ্ধে লড়াই করে। কিন্তু শ্রেণিভেদ চেতনার ভিত্তিই তো জাতিভেদ চেতনা। বলা ভালো, জাত-ভেদ চেতনা। কিন্তু সেই উচ্চশ্রেণির জাতক্রোধের বিরুদ্ধে আন্দোলন না করে, কেবলমাত্র শ্রেণিসংগ্রামের আন্দোলন করা ভ্রান্ত নয় কি? কিন্তু এই জাতপাতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হতে শোনা যায় দলিত সাহিত্যে। সুতরাং বলা যেতে পারে, দলিত সাহিত্যে প্রগতিচেতনা থাকলেও প্রগতি সাহিত্যে সেই অর্থে দলিত মানুষের যন্ত্রণার কথা অনুপস্থিত। এবার প্রশ্ন উঠল সাহিত্য আবার দলিত হয় না কি? সাহিত্যকে কোনো জাতের সীমানার মধ্যে আবদ্ধ করা কি সমীচীন? নিশ্চয়ই নয়। তবে দলিত সাহিত্যে জাতের কথা বলে এই কারণে, জাতব্যবস্থাকে সে উৎখাত করতে চায় তাই।

সর্বভারতীয় সাহিত্যের প্রেক্ষাপটে দলিত সাহিত্যের স্বরূপ :

সর্বভারতীয় সাহিত্যের প্রেক্ষাপটে আমরা দেখব সাহিত্যের বিভিন্ন ধরনের শ্রেণিকরণ আছে। তাদের মৌল বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তারা কোন্ কোন্ শ্রেণির অন্তর্গত এবং সেই সূত্রে আমরা দেখব দলিত সাহিত্যের অবস্থান কোন্ গোত্রে এবং প্রমাণ করবো দলিত সাহিত্যেরও স্বতন্ত্রতা আছে। আছে তার পরিচয়। কিন্তু সেই পরিচিতিসূচক স্বাতন্ত্র্যের স্বরূপটি নিম্নে আলোকপাত করা হল-

১. ভাষাকেন্দ্রিক সাহিত্য- সংস্কৃত সাহিত্য, ইংরেজি সাহিত্য, হিন্দি সাহিত্য, মারাঠি সাহিত্য, তামিল সাহিত্য, গুজরাটি সাহিত্য, বাংলা সাহিত্য ইত্যাদি।

২. ধর্মকেন্দ্রিক সাহিত্য- বৌদ্ধ সাহিত্য, মুসলিম সাহিত্য, জৈন সাহিত্য, বৈষ্ণব সাহিত্য, শাক্ত সাহিত্য, মতুয়া সাহিত্য, নাথ সাহিত্য ইত্যাদি।

৩. প্রবৃত্তির আধারগত সাহিত্য- ভক্তি সাহিত্য, সন্ত সাহিত্য, জনবাদী সাহিত্য, প্রগতি সাহিত্য ইত্যাদি।

৪. বর্ণবাদী সাহিত্য- শতপথ ব্রাহ্মণ, তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণ ইত্যাদি।

৫. জাতীয় সাহিত্য-ভারতীয় সাহিত্য, পাশাপাশি আমেরিকান সাহিত্য, ইউরোপীয় সাহিত্য প্রভৃতি।

৬. আন্তর্জাতিক সাহিত্য- এশিয় সাহিত্য, প্রাচ্য সাহিত্য, পাশ্চাত্য সাহিত্য।

৭. যুগীয় সাহিত্য- প্রাচীন যুগের সাহিত্য, মধ্যযুগের সাহিত্য, আধুনিক যুগের সাহিত্য প্রভৃতি।

৮. আঞ্চলিক সাহিত্য- বাংলার সাহিত্য।

৯. মতাদর্শগত সাহিত্য-মার্কসীয়-সাহিত্য, রবীন্দ্র-সাহিত্য, শেক্সপীয়রীয় সাহিত্য।

১০. আত্মনের সাহিত্য- 'দলিত সাহিত্য'।

দলিত সাহিত্য : আত্মনের সাহিত্য :

বর্তমান গবেষণা কর্মে 'দলিত সাহিত্য'কে 'আত্মনের সাহিত্য' বলতে চাই। কেননা দলিত সাহিত্য আপদমস্তক দলিত আত্মনের বেদনার দহন কথা। দলিতের লেখনীতে দলিত মানবের যন্ত্রণার স্বরলিপি। তাই 'দলিত আত্মপরিচিতি' (সেল্‌ফ আইডেন্টিটি অফ দলিত)-কেই তুলে ধরে। বিশেষ কোনো ব্যক্তির বিরোধিতা করে না। হয়তো ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে তাঁর মনন-চিন্তন-দর্শন-অবলম্বনে সাহিত্য রচিত হতে পারে। হচ্ছেও তাই। আমরা সেই ধরনের সাহিত্যকে বলছি দলিত আত্মজীবনী। অর্থাৎ দলিত শব্দের মধ্যে যেমন 'we' অর্থাৎ 'আমরা'র কলতান আছে। তেমনি আছে 'I' অর্থাৎ 'আমি'র বহুস্বর। আসলে 'আমরা' চায় 'আমি' হতে। 'আমি'ও চায় 'আমরা' পরিচয়ে বাঁচতে। এই 'আমি' এবং 'আমরা' উভয়েই দুই দলের দুই রূপ। 'আমরা' দলিত হিসাবে পরিচিতি ও আত্মসম্মান অর্জনের লড়াইয়ে অবতীর্ণ সত্তা। আর 'আমি' হল অর্জিত দলিত অস্মিতা সত্তা। আর এই 'আমি' এবং 'আমরা' তো 'আত্মন' বা 'self '-এর দুই ভিন্ন রূপ। একটি একবচনাত্মক। অন্যটি বহুবচনাত্মক। দুটিই আবার যুগপৎ অস্তিত্বসূচক ও অস্মিতাসূচক। যা দলিত সাহিত্যকে প্রতিষ্ঠা দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সাহিত্যের আত্মনিরপেক্ষ হওয়াই শ্রেয়। 'আত্মনের সাহিত্য' দলিত সাহিত্যকে অন্তর্ভুক্ত করলেও দলিত সাহিত্য শৃঙ্খল মোচন করে আত্মনের জানলা দিয়ে বস্তুবিশ্বের আকাশকে দেখান। এই 'আত্মন' দলিত সাহিত্যে 'বস্তু' হয়ে উঠেছে। আত্মনের কথা দিয়ে তাঁরা রচনা করলেন আত্মকথার আখ্যান। নিজেরাই হয়ে উঠলেন নিজেদের সাহিত্যের 'বিষয়'। 'আত্মকথা'ই হয়ে উঠেছে লেখকতার ইতিবৃত্ত। অবশ্য গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ বিভিন্ন সাহিত্য প্রকরণ দলিত সাহিত্যে লক্ষণীয়। যে-লেখককে দলিতের জীবন কাটাতে হয়নি তাঁর সাহিত্যে এই আত্মবোধ ভাষা পাবে না। তা দলিল লেখকদেরই একান্ত নিজস্ব সম্পদ। তাই দলিত সাহিত্যকে 'আত্মনের সাহিত্যে' অন্তর্ভুক্ত করার যুক্তি হিসেবে বলা যায়, দেবেশ রায় তাঁর 'দলিত' নামক সংকলনটির ভূমিকা অংশের শিরোনামই দিয়েছেন– 'আত্মপরিচয় ও উন্মোচন'। এমনকি এ-প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্যটিও যুক্তিযুক্ত -

> "তাদের (দলিত সাহিত্যের লেখকদের) আত্মকথা হয়ে ওঠে বাস্তবে দলিত। ...সেই আত্মকথা রচনায় তাঁদের এক ধরনের মুক্তি ঘটে- সে-মুক্তি কোনো রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে সব সময় আসে না, সে-মুক্তি কোনো রাজনৈতিক নেতার নির্দেশে নিজের নতুন ভূমিকা আবিষ্কারেও সব সময় আসে না ...নিজের যে দৈনন্দিন অস্তিত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, সেই অস্তিত্বকে নিজের বাহিরে রেখে দেখা। এই মুক্তি ঘটানো শিল্প-সাহিত্যের কাজ।"[৫৪]

দলিত সাহিত্যিক : অনুভবে ও চেতনায় :

দলিত সাহিত্যিক প্রথমত দলিত-শ্রেণির জাতক হবেন। অবশ্য যেকোনো দলিত ব্যক্তিই দলিত লেখক বা সাহিত্যিক অভিধা পেতে পারেন না। দলিত পরিচিতির মতো এই 'দলিত লেখক' অভিধাও অর্জনের বিষয়। সেই সৃজনশীল 'দলিত ব্যক্তিত্ব' (দলিত পার্সোনালিটি)-ই দলিত লেখক (দলিত রাইটার) শিরোপা পাওয়ার যোগ্য, যাঁর জাগ্রত চৈতন্যে এবং জীবন অভিজ্ঞতায় থাকবে দলিত চেতনার বিবেকী বীক্ষণ। থাকবে দলিত দর্শন ও দলিত বাস্তবতার ধারণা। থাকবে চিন্তন শক্তির প্রাখর্য। আত্মোন্নতির প্রয়াস। আত্মপ্রতিষ্ঠার অভীপ্সা। আত্ম আবিষ্কারের প্রেরণা। এমনকি থাকবে মানবতার

উচ্চাদর্শের প্রতি আস্থা। বাংলা সাহিত্যের দলিত-তাত্ত্বিক, প্রাবন্ধিক ও সাহিত্যিক মনোহর মৌলিবিশ্বাস দলিত লেখকদের 'সংখ্যাল্প-লেখক' আখ্যা দিয়েছেন।[৫৫] তাছাড়া তিনি স্বাক্ষর ও শিক্ষিত ব্যক্তির 'লেখক' হয়ে ওঠার জন্য অত্যাবশ্যকীয় তিনটি গুণের কথা উল্লেখ করেছেন- [৬৫]

১. **বৌদ্ধিক স্বচ্ছতা** (ইন্টেলেকচুয়াল ক্লারিটি)

২. **বিচিন্তন ক্ষমতা** (থিঙ্কিং পাওয়ার)

৩. **আত্মবিশ্বাস** (সেলফ কনফিডেন্স)

অবশ্য একথাও ঠিক যে, এই গুণত্রয় অর্জন করে যদি কোনো সৃজনশীল ব্যক্তি জীবনের 'suffering' -এর সংবেদনপূর্ণ প্রতীতি ও প্রত্যয় নিয়ে এবং দলিত চেতনায় প্রবুদ্ধ হয়ে সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে দলিত মানবের বেদনাকে বাগ্ময় করে তোলেন, তাহলে তিনিও 'দলিত লেখক' আখ্যা পাওয়ার যোগ্য।

দলিত সাহিত্য : সংজ্ঞায় ও সজ্ঞায় :

দলিত সাহিত্য দলিতের সাহিত্য। দলিতের দ্বারা রচিত সাহিত্য। মূলত দলিতের জন্য রচিত সাহিত্য হলেও দলিত নয় অথচ অবহেলিত ও পীড়িত এমন মানবত্মার ব্যথা-দহনও হতে পারে দলিত সাহিত্যের বিষয়। অর্থাৎ দলিতত্ব থেকে মুক্তির সাহিত্যই দলিত সাহিত্য। কিন্তু এখানে বলা ভাল, দলিতের কলমে লেখা যেকোনো সাহিত্যই দলিত সাহিত্যে হতে পারেনা। আগে তাকে 'সাহিত্য' পদবাচ্য হয়ে উঠতে হবে। অতএব দলিত মানুষের কোনো লিখন কর্ম তখনই 'দলিত সাহিত্য' হিসাবে আখ্যায়িত হবে, যখন সেই সাহিত্যের মধ্যে থাকবে দলিত পরিচিতি, অস্বীকৃতি, যন্ত্রণা, বিদ্রোহ এবং সৃষ্টি। বস্তুত দলিত শ্রেণির মানুষদের প্রজ্ঞাদীপিত প্রত্যয়ে ও প্রতীতিতে দলিতত্ব থেকে মুক্তি প্রয়াসের লক্ষ্যে সৃষ্ট আত্মস্মৃতিমূলক আখ্যান-গল্প-উপন্যাস-কবিতা-নাটক-প্রবন্ধকে আমরা বলব 'দলিত সাহিত্য' বা 'দলিত মুক্তির সাহিত্য'।

দলিত সাহিত্যের বিশিষ্টতার নানা মাত্রা :

আফ্রিকান-আমেরিকান **'নিগ্রো সাহিত্য' বা 'কৃষ্ণ সাহিত্য'-এর** অন্যতম তাত্ত্বিক **ফ্রানৎস ফানোঁ** কৃষ্ণ সাহিত্যের তিনটি লক্ষণের কথা বলেছেন-[৫৭]

১. **নিগ্রো চেতনার সমবায় (**অ্যাসিমিলেশন)

২. **নিগ্রো জনতত্ত্বের আবিষ্কার** (এথনিক ডিসকভারি)

৩. **বিদ্রোহ** (রেভোলিউশন)

এখন ফ্রানৎস ফানোঁর মতকে সমর্থন জানিয়ে ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে দলিত সাহিত্যের **তিনটি মৌলিক বৈশিষ্ট্যের**[৫৮] কথা বলেছেন -

১. **যন্ত্রণা বা ভোগ (**সাফারিং)

২. **বিদ্রোহ** (রিভোল্ট)

৩. **অস্বীকৃতি বা না-ত্ব** (নিগেশন)

কিন্তু মনোহরমৌলি বিশ্বাস উপরিউক্ত তিনটি লক্ষণ ছাড়াও আরও একটি লক্ষণের কথা বলেছেন। যেটি উনি গভীরভাবে জোরও দিয়েছেন।লক্ষণটি হল- 'নির্মাণ'[৫৯] অর্থাৎ ক্রিয়েশন। তবে কথাটিকে একটু পরিবর্তন করে বলা ভালো তা 'নির্মাণ' নয়, প্রকৃত 'সৃষ্টি'। যতীন বালা আবার যন্ত্রণা, বিদ্রোহ, অস্বীকৃতি, এবং সৃষ্টি (কারো মতে নির্মাণ)- এই চারটি লক্ষণকে মান্যতা দিয়েও নিগ্রো সাহিত্যের অনুকরণে 'জনতত্ত্বের আবিষ্কার' বিষয়ক বৈশিষ্ট্যটিকে ভারতীয় দলিত সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যর সঙ্গে যুক্ত করলেন।[৬০]

এখন দলিত সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক—

এক. যন্ত্রণা - দলিত সাহিত্যে দলিত জীবনের অম্ল-মধুর অভিজ্ঞতা ব্যক্ত হবে সেটা বড় কথা নয়। তবে সেই কাহিনির

মধ্যে থাকবে দলিত-জীবনের যন্ত্রণা ও ভোগের তীব্র অভিজ্ঞতা। থাকবে ঘৃণার অভিজ্ঞতা। আর এ-অভিজ্ঞতা একান্তই দলিতের। অন্য কোনো অ-দলিত এই যন্ত্রণা অনুমান করেন মাত্র। যন্ত্রণা ভোগের যে বেদনা, সেই বেদনার কাঁটার আঘাত তাকে অনুভব করতে হয় না। অনেকে যুক্তি দেখাবেন যে, শ্রেণিগত বিদ্বেষ বা সমাজ বাস্তবতায় ধৃত সত্যকে প্রকাশ করলেই তো হল কিন্তু না, দলিত বাস্তবতা আবরণহীন তাই সেই নিরাবরণ ধৃত সত্যকে প্রকাশ করলেই তো হলো। কিন্তু না। দলিত বাস্তবতা আবরণহীন। তাই সেই নিরাবরণ সংস্কৃতিকে পূর্ণমাত্রায় সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে উপস্থাপিত করতে হলে তাকে তো আগে 'যন্ত্রণা' বা 'সাফারিং' ভোগ করতেই হবে।

দুই. বিদ্রোহ - চেতনাতেই দলিত সাহিত্য প্রতিবাদী। 'দলিত' শব্দের মধ্যে নিহিত আছে 'বিদ্রোহী' সত্তা। দলিতত্ত্ব থেকে মুক্তির প্রথম ধাপই হল বিদ্রোহ। তাছাড়া দলিত সাহিত্য তো একটি আন্দোলন।আন্দোলনের গর্ভেই থাকে বিদ্রোহের বীজ। এই বিদ্রোহ 'ব্রাহ্মণ্য-সংস্কার, পুরোহিততন্ত্র, জাতপাত, বর্ণভেদ, মনুস্মৃতি এবং বৈদিক বিধিবিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।যে-সমস্ত লেখায় এই জাত-বৈরিতার প্রতি বিদ্রোহ কোনোরূপ ভাব-লেশ থাকে না সেই-সাহিত্য 'দলিত সাহিত্য' হতে পারে না।

তিন. অস্বীকৃতি - দলিত সাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল 'অস্বীকৃতি'। মূলত ব্রাহ্মণ্যবাদী মূল্যবোধ, উচ্চবর্গীয় সংস্কার, মনুবাদী সাহিত্যতত্ত্ব, সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র ও রসবাদী নন্দনতত্ত্ব তথা 'মূলধারার সাহিত্য' (মেনস্ট্রিম লিটারেচার)-এর তাবৎ বিষয় ও আঙ্গিককে অস্বীকার করে থাকে দলিত সাহিত্য।

চার. সৃষ্টি - দলিত সাহিত্য কোনো অনুকরণাত্মক শিল্পকর্ম নয়। তা সৃজনাত্মক। শুধুই যন্ত্রনা, বিদ্রোহ, অস্বীকৃতি, ক্ষোভ, ঘৃণার কথা বলবে না। বিস্ময়, প্রেম ও কল্পনার সহাবস্থানে তা সৃজনকলায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। আসলে দলিত সাহিত্য তো সৃজনশীল লেখকদের আন্দোলন। সৃষ্টিশীল মনন ও মেধা লেখককে নতুন মূল্যবোধ এবং নব্যবাস্তবতাবাদ প্রতিষ্ঠায় প্রবুদ্ধ করে থাকে।

পাঁচ. জনতত্ত্বের আবিষ্কার : দলিতরা খন্ডিত। শ্রেণিতে-বর্ণে বিভাজিত। স্ব-সংস্কৃতি থেকে বিতাড়িত, বিস্থাপিত। অনেকে ধর্মান্তরিত। তবুও তারাই তো মূলনিবাসী। আদিমনিবাসী (Aboriginal)। তাই আদিম বসবাসকারী মানুষদের হারানো ঐতিহ্য, হারানো সংস্কৃতি, বিনষ্ট হওয়ার দর্শন, হারানো পরিচিতির পুনরুদ্ধার এবং পুনরাবিষ্কার দলিত সাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

দলিত সাহিত্যের পাঠক : বেদনার সন্তান :

'সকলেই পাঠক নয়, কেউ কেউ পাঠক'।[৬১] শঙ্খ ঘোষের এই বৌদ্ধিক চিন্তনটি দলিত সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। বলা যায়, সকলেই দলিত সাহিত্যের পাঠক নয়, কেউ কেউ দলিত সাহিত্যের পাঠক। আমরা তো আসলে নিজেকে দেখতে পাই না। দেখেও দেখি না। যাদের দেখার অভীপ্সা আছে, তাদের তো একটা যোগ্য আয়নার দরকার। বই হল সেই আয়না। বইয়ের পাতায়-অক্ষরে-ভাষায়-ভাবে যিনি নিজেকে দেখেন তিনিই 'প্রকৃত পাঠক'। তাঁর কাছে বই পড়ায় কোনো ছুঁতমার্গ ভাব নেই। এই বই পড়বো না, ওই বই পড়বো না এমনটা হবে না। কিন্তু দেখা যাবে লেখকের যেমন নিজস্ব রুচি থাকে, পাঠকেরও তেমনি সেই রুচি আছে। কেউ সেই পূর্বার্জিতরুচি নিয়েই পাঠ করেন। কারো বা পাঠের ফলে নতুন রুচিবোধ জন্মায়। এখন সচারাচর যে-রুচি পাঠককে প্রবুদ্ধ করে তা হল- পাঠের শেষে এক 'ব্রহ্মাস্বাদসহোদর' আনন্দ লাভ করবে পাঠক। দলিত সাহিত্য সেদিক থেকে আলাদা। দলিত সাহিত্য পাঠককে শুধু আনন্দই দেবে না, সে আঘাতও করবে। আঘাতের পর আঘাত। আঘাতের মধ্যে দিয়ে পাঠকের মনের অচলায়তনকে ভাঙবে। প্রচলিত সংস্কারকে ভাঙবে। তারপর তার আত্মপরিচিতি উন্মোচন করবে। আর যে-পাঠক এসবের দ্বারা প্রবুদ্ধ হবেন তিনিই হবেন দলিত সাহিত্যের পাঠক। দলিত সাহিত্যের পাঠক যিনি,তিনি অবসরযাপনের জন্য দলিত সাহিত্য পাঠ করবেন না। কিংবা নিছক যৌনতৃষ্ণা নিবারণের জন্যও নয়। যাদের মনের সীমানা ফ্লাট কালচার বা কর্পোরেট সংস্কৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ তারাও নন দলিত সাহিত্যের পাঠক। দলিত সাহিত্যের পাঠক অবলীলায় মাটির কাছাকাছি নেমে আসবেন। যাপন করবেন মাটি-মানুষের জীবন। অর্থাৎ দলিত সাহিত্যের পাঠক সেই সমস্ত মানুষেরা যারা সাহিত্যের

মধ্যে দিয়ে নিজেদের দলিতত্বের যন্ত্রণাকে অনুভব করেন তারা এই শ্রেণির পাঠক। নিজের জীবনকে, জীবনের না-পাওয়াকে খুঁজে পাবেন। হারানো অধিকারকে ফিরে পাবেন সাহিত্যের পাতায়। অবশ্য পাঠকের কোনো দলিত-অদলিত ভেদাভেদ নেই। দলিতের মতো যন্ত্রণার শিকার না হলেও দলিতের যন্ত্রণার স্বরূপকে জানা এবং সমান-হৃদয়ে অনুভব করার প্রয়াসে যিনি বা যাঁরা দলিত সাহিত্য পাঠ করেন তিনি বা তাঁরা সকলেই দলিত সাহিত্যের পাঠক এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। অবশ্য দলিত হন আর অদলিত হন দলিত সাহিত্যের পাঠক ললিত সাহিত্যের বোধ ও বোধি নিয়ে দলিত সাহিত্য পাঠ করলে তাঁর ভ্রান্তি ঘটবেই। কেননা এক ধরনের পাঠক আছেন যাঁরা মনোরঞ্জনের জন্যই কেবল সাহিত্য পাঠ করেন। তাঁরা দলিত সাহিত্যের পাঠক হওয়ার যোগ্যতা হারাবেন। দলিত সাহিত্যের পাঠকের সুপরিকল্পিত উদ্দেশ্য থাকবে 'দলিত আইডেন্টিটি'-কে অনুসন্ধান ক'রে ফেরা। আত্মপ্রসাদ লাভ তো আছেই। উপরন্তু দলিত সাহিত্যের পাঠক আত্মবিশ্বাস অর্জন করবেন। তাঁর চেতনা বিপ্লবাত্মক হবে। অস্বীকৃতি অর্থাৎ 'না-ত্ব'কে আঁকড়ে ধরে প্রচলিত উচ্চবর্গীয় সমাজব্যবস্থার শৃঙ্খল মোচনে বিদ্রোহ ঘোষণায় প্রণোদিত হবেন। দলিত সাহিত্যিক ও দলিত সাহিত্যের পাঠক একযোগে গড়ে তুলবেন দলিত মুক্তি আন্দোলন। শেষপর্যন্ত দলিত সাহিত্যের পাঠক সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে ছাড়িয়ে আত্মিকতায় উত্তরণের সন্ধান করে ফিরবেন দলিত সাহিত্য পঠনের মধ্য দিয়ে।

দলিত নন্দনতত্ত্ব : আত্মবীক্ষণের ভিন্ন পাঠ ও নব্যবাস্তবতাবাদের ভিত্তিভূমি :

গোকুল নন্দিনীর রকম-সকম কিছুই বোঝেনা। সে 'মোটা গোছের চেহারাই' বিশ্বাস করে। চন্দ্রার চোখেও নন্দিনী কেবল আট প্রহর 'সুন্দরীপনা' করে বেড়ায়। শ্রমিকদের মধ্যে দেখার দৃষ্টি আছে একমাত্র বিশুর। সুন্দর-অসুন্দরের ধারণা তার পাকা। তাইতো বিশু বলে-

> "নরকেও সুন্দর আছে, কিন্তু সুন্দরকে কেউ সেখানে বুঝতেই পারেনা, নরকবাসীর সবচেয়ে বড় সাজা তাই।"[৬২]

কথাটি দলিত সাহিত্যের নন্দনতত্ত্বের আলোচনায় খুবই প্রাসঙ্গিক। 'নন্দন' কথাটির অর্থ হল 'আনন্দ'। অন্য একটি অর্থও আছে- 'যা আনন্দ দান করে' অর্থাৎ 'সৌন্দর্য'। আর সেই সৌন্দর্যবিষয়ক শাস্ত্র হলো 'নন্দনতত্ত্ব' বা 'এস্থেটিকস'। এই 'সুন্দর'-এর ধারণা আমাদের প্রচলিত বোধে প্রোথিত। কেননা ভারতীয় দর্শন নির্ভর করে আছে অধ্যাত্মবিদ্যার উপর। সেই প্রচলিত দর্শনের ভিত্তিতেই নির্ধারিত হয়ে চলেছে তাবৎ পাঠক্রম ও পাঠকৃতি। তাই 'সেই-সুন্দরে'র ধারণায় মিশে আছে শুভত্ববোধ। এক অপার স্বর্গীয় সুখ। মিশে আছে নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যলোকের কল্পনা। মিশে আছে 'রস বৈ সঃ'-গোছের ব্রহ্মের ধারণা। 'পরমে'র বোধ। 'এক'-এর 'বহু'-রূপের চিন্তন। দলিত সাহিত্যের নন্দনতত্ত্বে যে 'সুন্দর', তা আসলে 'নরকের সুন্দর'। বিশুদের চোখেই ধরা পড়ে। অর্থাৎ দলিত নন্দনতত্ত্ব আসলে 'দলিতের চেতনা' কিংবা 'দলিত চেতনা'র উপর প্রতিষ্ঠিত। মূলধারার সাহিত্যের থেকে তা আলাদা। মূলধারার সাহিত্য বলতে এখানে অবশ্য ব্রাহ্মণ্য-ভাবধারা-পুষ্ট সাহিত্য প্রবাহকে ইঙ্গিত প্রদান করা হচ্ছে। তার প্রধান তফাৎ হল এই যে, উচ্চবর্গীয় সেই সাহিত্যবোধ বা সমালোচনা কিংবা নন্দনতাত্ত্বিক প্রজ্ঞা তা কিন্তু 'কলাকৈবল্যবাদী' (আর্টস্ ফর আর্ট সেক) তত্ত্বের উপর দাঁড়িয়ে আছে। সেখানে দলিত সাহিত্য সমালোচনা এবং নন্দনতত্ত্ব বিচার্য হয়ে থাকে 'আর্টস্ ফর ম্যান সেক' বা 'উপযোগবাদী তত্ত্বে'র ভিত্তিতে। কাজেই দলিত সাহিত্য অসুন্দরের সাহিত্য; কিংবা দলিত সাহিত্যে কোনো নান্দনিক অনুভব নেই, এই অভিযোগ করা অযৌক্তিক। এমনকি এই অভিযোগ ও যুক্তিহীন-তাহলে দলিত সাহিত্য 'অসত্যের সাহিত্য'। 'অ-শিবের সাহিত্য'। 'সত্য, শিব ও সুন্দর'। বিষায়ক আধ্যাত্মবাদী কল্পনা দলিত সাহিত্যে কখনোই পাওয়া যাবে না। কেননা এ সাহিত্যে তা প্রত্যাখ্যান করা হয়। কিন্তু দলিত সাহিত্যে ও সত্য, শিবং ও সুন্দর ধারণা আছে। এবং তা রুঢ় বাস্তবের ভিত্তিপ্রস্তরের উপর প্রতিষ্ঠিত। কি সেই সত্য? শিব? ও সুন্দর? যা দলিত সাহিত্যকে আরো বাস্তবসম্মত করে তোলে? উত্তরে বলা হচ্ছে দলিত নন্দনতত্ত্বের 'অ-সত্য' হল-অনন্তকালের সত্য। সে সত্য 'মানুষ'। দলিত ও দলিতেতর সব মানুষ। আর 'অ-শিব' হল অন্তকালের শিবত্ত্বের ধারণা। তা দলিত মানুষের স্বাধীনতা, সমতা, ন্যায় ও

স্বাধিকার। 'অ-সুন্দর' হল 'অনন্তকালে যা সুন্দর তাই'। তা হল দলিত অস্মিতা। যা মানুষ্যত্বের পরিচয়ক। 'দলিত আমি'র অন্তরে যখন 'আমিও দলিত' - এই অনুভব জাগ্রত হবে, তখনই দলিত সাহিত্যের নন্দনতত্ত্বের মধ্যে সে সত্যের, শিবের ও আনন্দের ধারণা লাভ করবে। তাহলে দলিত সাহিত্যের এই যে 'আনন্দ' তা নিছক আত্মপ্রসাদ লাভের জন্য নয়। নয় নিছক মনোরঞ্জনের। বর্ণবাদী সমাজ ব্যবস্থাকে অস্বীকার ও বিদ্রোহের মধ্যে দিয়ে দলিত হিসাবে আমরা যে আত্মবিশ্বাস জন্মালো -এটাই দলিত সাহিত্যের 'আনন্দ'। তাইতো এই আনন্দের সঙ্গে মিশে আছে প্রগাঢ় বেদনা। এ বেদনা দলিতের সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া বেদনা। তাই এই বেদনা থেকে জন্ম নেয় দলিত চেতনা। যা তাকে বিপ্লবাত্মক করে তোলে। এক সময় বিদ্রোহের সৃষ্টি করে। তাহলে বলা যেতে পারে, দলিত সাহিত্যেরও একটা নিজস্ব 'এথিক্স' বা নীতি আছে। সেটাই তার 'এস্থেটিকস'। কি সেই 'এস্থেটিকস'? না, তা হলো 'দলিত সচেতনা'। দলিত মানসিকতা। যা অবনমনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঘোষণা করে। যা দলিত জীবনের অতীত ও বর্তমানের বেদনার দহন-কথা থেকেই উদ্ভূত। তাই দলিত নন্দনতত্ত্বের এই ধারণা সহানুভূতিমূলক নয়, তা সমানুভূতিমূলক। তা হল 'এমপ্যাথিক্যাল দলিত এসথেটিকস্' অর্থাৎ 'আত্মবীক্ষণমুলক দলিত নন্দনতত্ত্ব'। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। শৃঙ্খল অর্থাৎ শিকল তা তো বন্ধনের প্রতীক। এটিকে কেন্দ্র করে দুটি শ্রেণি তৈরি হয়। একজন বন্দী করে। আর একজন বন্দি হয়। দুজনে দৃষ্টিতেই সুন্দর-অসুন্দর দুই আছে। বন্দি করলো যে, তার তো বাঁধতে পারাই আনন্দ। তাঁর দৃষ্টিতে 'শৃঙ্খল' হল 'সুন্দর' এবং 'বন্দি' হল 'অসুন্দর'। কিন্তু যে বন্দী হলো তার দৃষ্টিতে শৃঙ্খল এবং বাঁধনকর্তা দুই-ই 'অসুন্দর'। অ-দলিত সমালোচক বলবেন দলিত সাহিত্য তো জাতপাত ব্যবস্থার শৃঙ্খলে বন্দি মানুষের যন্ত্রণার কথা ব্যক্ত হয়। তা হল দলিত সাহিত্য অসুন্দরেরই আখ্যান। পার্থক্য তো এখানেই দেখার দৃষ্টির ভিন্নতায়। দেখাটা তো সহানুভূতিতে দেখা। আসল দেখা হবে সমান অনুভূতি দিয়ে দেখা। বোধে নয়, দেখতে হবে অনুভবে। তখন দেখা যাবে শৃঙ্খলবন্দির চোখে অসুন্দরের প্রতীক যে শৃঙ্খল তার বন্ধন মুক্ত করাই তার আনন্দ।

আর এক প্রকার নন্দনতত্ত্ব দলিত সাহিত্যে বিদ্যমান। তা হল, নব্যবাস্তবকেন্দ্রিক দলিত নন্দনতত্ত্ব। আসলে রুঢ় বাস্তবের নির্মাণ দলিত সাহিত্যের প্রাণ। কল্পনার ভ্রান্তিবিলাস এ-সাহিত্যে অনুপস্থিত। মেহনতী মানুষের জীবনের স্বাদে ও বিষস্বাদে ভরপুর এই সাহিত্য। ভূমিবাস্তবতার সঙ্গে দলিত সাহিত্যের যোগ নিবিড়। অবশ্য অনেকে বলেন দলিত সাহিত্যে 'শিবম' এর ধারণা নেই। সত্যকে নিয়েই তার কারবার। আর যা সত্য তাই-ই দলিত সাহিত্যের 'সুন্দর'। কেননা নব্যবাস্তববের ধারণায় 'শিবম' অনুপস্থিত। যুক্তিটি অমূলকও নয়। তবে গ্রহণযোগ্যতায় জিজ্ঞাসা চিহ্ন আছে। 'মানুষ' যেখানে মূল কথা সেখানে 'শিবম' (ঐশীভাব নয়) অর্থাৎ আত্মনের বোধ বা আত্মনের অনুভব বা 'আমি'র অনুভব- তা কি করে বর্জনীয় হয়? যাইহোক 'নব্যবাস্তবতা'কে অস্বীকার করা যায় না। আসলে মূলধারার যে-সাহিত্য তার উপস্থাপনে আখ্যানের বর্ণনায় দেখা যায় তা অধিকাংশই রুপজ সৌন্দর্যের বর্ণনা। এমনকি সে-সাহিত্য সিংহভাগই অধিবিদ্যামূলক (মেটাফিজিক্যাল), দার্শনিক, প্রতীকী, সাংকেতিক এবং কাল্পনিক। অপরপক্ষে দলিত সাহিত্যে এই দৃষ্টিকোণ সম্পূর্ণ পরিত্যজ্য। দলিত সাহিত্যিক সমাজকেন্দ্রিক বাস্তবতায় মাতৃভাষার মাধ্যমেই তাঁর জীবন জিজ্ঞাসাকে, তাঁর জীবনাভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করেন। দলিত লেখকের প্রকাশের ভাষা কখনোই 'রোমান্টিক ভিউ অফ লাইফ' থেকে আসে না; তা উদ্ভূত হয় 'রিয়ালিস্টিক ভিউ অফ লাইফ' থেকেই। সে কারণে দলিত সাহিত্য ঈশ্বরের সঙ্গে মানবের সম্পর্ককে অস্বীকার করে। দলিতবাস্তবতায় ঈশ্বর, জাতি কিংবা জাত অপেক্ষা মানুষই শ্রেষ্ঠ, মানুষ এই সাহিত্যের 'সুপেরিয়র হিরো'। আর এই নন্দনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যাকে বলা হয় 'নব্যবাস্তবতাকেন্দ্রিক দলিত নন্দনতত্ত্ব'। বস্তুবাদী সাহিত্যের যে আন্দোলন শুরু হয় কল্লোল যুগের লেখক গোষ্ঠী হাত ধরে, তা ছিল মূলত রিরংসাতাড়িত অবচেতন মনের অসংযমী ও অবদমিত লালসার প্রকাশ। যৌনক্ষুধা নিবৃত্তির অভিপ্রায়ী সাহিত্য রচনা। ন্যুট হামসুন, টি.এস.এলিট, এমিল জোলা ছিলেন তাঁদের প্রেরণা। বুদ্ধদেব বসু ,অচিন্ত্য সেনগুপ্ত ছিলেন তাঁদের কর্ণধার। সেই কল্লোলীয় বাস্তবতা ছিল 'ছদ্ম বাস্তবতা' (সিউডো রিয়ালিটি)।[৬৩] হারিং জেনারেশনও এক ধরনের সাহিত্য আন্দোলন করে। সেখানে যে-বাস্তবতাকে দেখি তাতে নারী-শরীরের নগ্নতাই প্রাধান্য পায়। কিন্তু দলিত সাহিত্যের এই যে বাস্তবতা, তা আসলে আত্মসচেতনতার বাস্তবতা। যে-বাস্তবতা আত্মসচেতক দলিত মানবকে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে লিপ্ত হওয়ার প্রেরণা জোগায়। কিন্তু 'সেক্স' আর

'ভায়োলেন্স' অর্থাৎ 'যৌনতা' এবং 'হিংস্রতা' দলিত সাহিত্যে কখনোই 'সত্য' হয়ে ওঠে না। দলিত সাহিত্যের নন্দনতত্ত্বে তাই 'সত্য' হয়ে ওঠে 'দ্বন্দ্বসমন্বয়' বা 'দ্বন্দ্ব মিলন'।[৬৪] আসল কথা হল সত্যের প্রকাশ সরল। আবার জটিলও। কেননা, সত্যের মধ্যে নিহিত আছে বিপরীতের সমন্বিতি। জাতভেদ, বর্ণভেদ এসব মিথ্যা। আর এটিই তো নির্ভেজাল সত্য। কিন্তু সমস্যা কোথায়? সমস্যা এইখানে যে, এই মিথ্যাত্ত্বকে প্রমাণ করে সত্যতাকে প্রতিষ্ঠা দিতে গেলে স্বাভাবিকভাবেই চলে আসে দ্বন্দ্ব। আসে সংকট। আর দলিত সাহিত্যিক সেই দ্বন্দ্বের ভিতর থেকে এক সমন্বয়ে পৌঁছান। অবশ্য বাস্তবের কাঁকর ছড়ানো পথেই। তবে বিপ্লবের মধ্য দিয়ে পৌঁছান সেই সমন্বিতবোধে। যেখানে দলিত পরিচিতি হয়ে ওঠে বাস্তবতামণ্ডিত। আর এভাবেই নব্যবাস্তববাদ দলিত নন্দনতত্ত্বকে আরো শক্তিশালী করে তোলে।

দলিত সাহিত্যের ভাষা–শৈলী :

দলিত সাহিত্যে 'আঙ্গিক' (ফর্ম) অপেক্ষা বিষয় (কনটেন্ট) অধিক গুরুত্বপূর্ণ। দলিত সাহিত্যের কারবারই তো বস্তু-সত্যকে নিয়ে। ভাব-সত্যকে নয়। 'ভাব' অর্থে এখানে 'কল্পনা'। সেকারণে রূপাঙ্গিকগত যে সৌন্দর্য, তা দলিত সাহিত্যে গৌণ। বর্ণনীয় বিষয়কে প্রকাশ করার জন্য যেটুকু প্রয়োজন রূপের সেই সারল্যে ও স্বল্প আয়তনেই দলিত সাহিত্য সীমাবদ্ধ। প্রসার ঘটিয়েছে বিষয়ের অভিনবত্বে। বিষয়ের বর্ণনায় ও উপস্থাপন প্রকৌশলের কেরামতিতে শৈল্পিক করে তুলেছে দলিত লেখকগণ। পার্থক্য আসলে অভিজ্ঞতার। ভাবে জানা অভিজ্ঞতার প্রকাশ রূপক-অলংকার-উপমার ছদ্মবেশে সজ্জিত হয়ে থাকে। কেননা, তা 'ভাব'কে সত্য করে তোলার জন্য। এ-সত্য কল্পনানির্ভর সত্য। দলিত লেখকের অভিজ্ঞতা তো অনুভবে-জানা অভিজ্ঞতা। তার প্রকাশ আবরণহীন হবেই তা বলাই বাহুল্য। তবে একথা অনস্বীকার্য, দলিত লেখকেরাও উপমাদি অলংকার প্রয়োগ করেন। অবশ্য তা দলিত সংস্কৃতি, দলিত চেতনা ও মূল্যবোধেকেই প্রকাশ করার জন্য, রূপদান করার জন্য। উপস্থাপিত বিষয়কে বাস্তবসম্মত করে তোলার জন্যই মূলত দলিত সাহিত্যের এই রূপক-উপমার আশ্রয়।

তাছাড়া অনেকে অভিযোগ করেন, দলিত সাহিত্যের ভাষা অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট। দলিত আখ্যানে ভাবনার-কথা কম, যৌনতার-কথা বেশি। তাই নাকি বিকৃত অভিরুচির পাঠককে নাকি বেশি আনন্দ দেয় দলিত সাহিত্য। এটি আসলে আর্যামির অহংকার। একটি আন্দোলনকে প্রতিহত করার বাসনা ভিন্ন কিছু বলা যায় কি? দলিত সাহিত্যে যৌনতার কথা আসবে না কেন? দলিত মানবী তো প্রতিনিয়ত যৌনতার শিকার হচ্ছেন। তার যন্ত্রণা প্রকাশে তো যৌনতার কথাই আসবে। কেউবা উচ্চবর্ণের পুরুষের চক্রান্তে পতিতাবৃত্তি অবলম্বনে বাধ্য হচ্ছেন। তাদের মুখের ভাষায় তো আর সঞ্জীবনী সুধা বর্ষিত হবে না। শিক্ষিত জনের মুখের ভাষা আর সাহিত্যের ভাষার সঙ্গে নিম্নবর্ণের মানুষদের মুখের ভাষা আর সাহিত্যের ভাষা আলাদা। নিম্নবর্ণের মানুষদের মুখের ভাষাই হয়ে উঠেছে দলিত সাহিত্যের ভাষা। কেননা মুখের ভাষা তার যাপনের ভাষা। তার লালনের ভাষা। সেই যাপিত ও লালিত জীবনের যন্ত্রণাকে, বেদনাকে প্রকাশ করতে হলে তো আর রমণীয় ভাষার দ্বারা প্রকাশ করা যাবে না। তার প্রকাশে অনেকটা রুক্ষ ভাষা ব্যবহৃত হবে। যে-ভাষার মধ্যে আছে দলিত মানবের অন্তরে বিপ্লব জাগিয়ে তোলার শক্তি। তাছাড়া উচ্চশিক্ষিত দলিতের কলমেও আমরা তার নিজস্ব ভাষার প্রকাশকেই দেখে থাকি। তাইতো দলিত সাহিত্যের ভাষা আসলে প্রান্তজনের মুখের ভাষা। প্রান্তজনের সংস্কৃতির পরিচায়ক সে ভাষা। ভাষা দিয়েই তো দলিত লেখক দলিত পরিচিতিকে অঙ্কন করে থাকেন। উত্তর-আধুনিক সময়ে ভাষাবিজ্ঞান চর্চায় দলিত সাহিত্যের ভাষাশৈলী তাই প্রাতিষ্ঠানিক আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে।

এমনকি, দলিত সাহিত্য তো রাষ্ট্রের আইনি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। সেই সূত্রে দলিত সাহিত্যের ভাষাশৈলীর মধ্যে সন্ত্রাসের ভাষা লক্ষ করা যায়। কেননা যে-ভাষা প্রয়োগ করে রাষ্ট্র দলিতের অন্তরে ত্রাস সঞ্চার করে থাকে, সেই রাষ্ট্রের হিংসাত্মক প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে প্রতিবিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তুলতে হলে দলিতের মুখেও সম্যক রূপে ত্রাস সঞ্চারকারী ভাষা প্রয়োগ আবশ্যক।

আবার দলিত মানুষের কর্মসংস্কৃতির মধ্যে আমরা লোকায়ত সংস্কৃতির হদিশ পাই। তাই সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে অন্ত্যেবাসীদের লোকজভাষা-সংস্কৃতি দলিত সাহিত্যের প্রধান সম্পদ, যা ভৌগোলিক বৈচিত্র্যে প্রান্তিক মানুষের বাস্তব

জীবনকে তুলে ধরে। তাছাড়া শিক্ষিত দলিত মানুষেরা যখন শহুরে সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে যায় তখন তাদের মুখের ভাষায় আমরা 'পিজিন' ও 'ক্রেয়ল' ভাষার বৈশিষ্ট্য লক্ষ করি, যা দলিত সাহিত্যেও ধরা পড়ে।

আবার প্রকরণগত দিক থেকে দলিত সাহিত্যের প্রধানতম প্রকরণ হল আত্মস্মৃতি। কেননা দলিত জীবনের অনুভব লেখকের একান্ত নিজস্ব অনুভব। আর এই নিজস্বতার বোধকে 'প্রকাশ' করে তুলতে হলে আপন জীবনাভিজ্ঞতার প্রতীতিকে সাহিত্যের পাতায় লিপিবদ্ধ করতে হলে চাই নিজস্ব কথনশৈলী। তাইতো আত্মস্মৃতিমূলকতা দলিত সাহিত্যের বিশিষ্ট প্রকরণ-কৌশল। আসলে এর মূলে আছে 'আত্মন' এর আবিষ্কারের অভীপ্সা। 'আত্ম'-বিশ্বকেই দলিত লেখকরা 'বস্তুবিশ্ব' করে তুলেছেন। তাই দলিত সাহিত্যের কথন রীতিতে উত্তমপুরুষীয় সর্বনামীয় বাচনভঙ্গীর প্রাধান্য দেখা যায়।

অবশ্য উপন্যাস, গল্প, কবিতা, নাটকের মতো নানা সাহিত্য প্রকরণ দলিত সাহিত্যে সুস্পষ্ট। কেননা দলিত লেখকের দলিত-সত্তা বা তাঁর বর্ণ-সত্তা কখনো কখনো আত্মকথনে প্রতিবন্ধক হয়ে উঠেছে। ফলত কল্পিত চরিত্রের উপর দলিত সত্তার চরিত্র ও জীবনানুভব অরোপ করে বক্তব্য প্রকাশের বিকল্প পথ হিসেবে গড়ে ওঠে উপন্যাস, গল্প নাটক, কবিতা। তাই আত্মজীবনী হিসেবে যে জীবন দলিত লেখকের সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বিষয় ছিল উপন্যাসের আখ্যানে কাহিনির পারম্পর্যে বিধৃত করে সেই জীবনকেই দলিত লেখকরা করে তুলেছেন বিশ্বগত। শিল্পগত প্রকরণের মধ্যে দিয়ে দলিত লেখকরা প্রচলিত অস্তিত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করলেন। আপন অস্তিত্বকে দেখলেন এবং দেখালেন 'আপন হতে বাহির হয়ে'। ছিন্ন করলেন তাবৎ ধর্মীয় অনুশাসন। আর এটাই তো দলিত সাহিত্যের শৈলীগত অভিনবত্ব।

দলিত সাহিত্যের বর্ণনারীতি অনেকটা বিশ্লেষণধর্মী। ভাবকেন্দ্রিকতাতে সে বর্ণনা হারিয়ে যায়নি। গতি তার সাবলী। অন্তর্মুখিনতা নেই। বহির্মুখিনতার প্রতি ঝোঁক তার প্রবল। কোথাও আবার নাটকোচিত দ্বন্দ্বনির্ভর সংলাপ প্রাধান্য পায়। বর্ণনার ভাষা বিষয়ানুগ বটে। চিত্রকল্পের অরণ্যে না-হেঁটে অনাড়ম্বর বাক্য প্রয়োগ ও প্রসাদগুণযুক্ত শব্দ ব্যবহারে মধ্যে দিয়ে দলিত সাহিত্য বাস্তবের ভূমিতে বিচরণ করে থাকে।

কাহিনি নির্মাণে দলিত সাহিত্যে আমরা মিথ-পুরাণের ভাঙা গড়া লক্ষ করি। বিভিন্ন পৌরাণিক চরিত্রকে দৈবী ভাবনা থেকে সরিয়ে এনে দলিত সংস্কৃতির সাযুজ্যে বিন্যস্ত করে তাকে ভূমি ও ভৌগোলিক বাস্তবতায় বিনির্মাণ করে থাকেন দলিত লেখকগণ, যা এই সাহিত্যের অন্যতম শৈলীগত বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে।

দলিত সাহিত্যের উদ্দেশ্যমুখিনতা :

১. দলিত পরিচিতিকে আন্তর্জাতিক করে তোলা।

২. দলিতত্ব থেকে নিম্নশ্রেণির সমস্ত মানুষদের মুক্ত করা।

৩. সামাজিক ন্যায়, সাম্য ও সমতার অনুসন্ধান এবং বাস্তবায়িত করা দলিত সাহিত্যের অন্যতম উদ্দেশ্য।

৪. শিল্পচর্চার বিষয় নয় সর্বভারতীয় পরিসরে মানব কল্যাণের সার্বিক বিকাশ সাধন করবে এ সাহিত্য।

৫. দলিত সাহিত্যের বিদ্রোহাত্মক ও বিপ্লবাত্মক বিশ্বসাহিত্যের যোগসূত্র স্থাপন।

৬. রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠাকে সাহিত্যের বিষয় হিসেবে প্রাধান্য দান।

৭. দলিত পরিচিতিকে অস্মিতা বোধে পরিণত করা অর্থাৎ আমি দলিত কিংবা আমরা দলিত-এই পরিচিতিকে উচ্চস্বরে বলার সাহস যোগানো এবং তাকে স্লোগানে পরিণত করা।

৮. প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান ও ভাষা সংস্কৃতিকে সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে পুনরুজ্জীবিত করা।

৯. দলিত ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার তৈরি করা।

১০. দলিতদের জীবনের মূল্যবোধ ও আদর্শকে প্রতিষ্ঠা দেওয়া।

১১. ডঃ বি আর আম্বেদকর, জ্যোতিরাও ফুলে ,রামস্বামী নাইকার পেরিয়ার প্রমুখদের চিন্তা-চেতনাকে, বৈপ্লবিক বীক্ষণকে সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করে তার বিশ্বব্যাপী বিস্তার ঘটানো।

১২. বৌদ্ধ দর্শনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং অভিন্ন দর্শনকে শ্রদ্ধা জানানো।

১৩. বর্ণহিন্দু মানসিকতা ও বর্ণহিন্দু সাহিত্য সমালোচনা করা ও তার ত্রুটি সংশোধন করা।

১৪. দলিত সাহিত্য দর্শন ও দলিত বাস্তবতাকে তৃণমূল স্তরের মানুষদের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

১৫. দলিত সাহিত্যের অন্যতম উদ্দেশ্য হবে তার পাঠক পরিসর বৃদ্ধি করা। সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে নিজের নিজের যন্ত্রণাকে অনুভব করতে পারা।

১৬. ব্রাহ্মণ্যবাদের নিষেধের লক্ষণরেখা মুছে ফেলা।

১৭. 'সমাজহীন সমাজে' (দীপেশ চক্রবর্তী কৃত) আত্মসম্মানের ও আত্মমর্যাদার অনুভূতিকে সন্ধান করা।

১৮. দলিতের চোখ দিয়ে দলিতকে দেখা, বোঝা ও অনুভব করা।

১৯. কাল্পনিক বাস্তবতাকে ভূমি বাস্তবতায় রূপান্তরিত করা এবং নব্য বাস্তবতাকে প্রতিষ্ঠা করা।

২০. দলিত সমাজের প্রতি দলিত সাহিত্যের দায়বদ্ধতা থাকবে। তা হল সমাজকে জাগিয়ে তোলা। সমস্যা ও তমসা মুক্ত করা।

২১. পরম্পরাগত লোকায়ত সংস্কৃতিকে, মাটি ও মানুষের সংস্কৃতিকে, লোককৃতিকে দলিত সাহিত্যের পাতায় স্থান দেওয়া।

২২. দলিত সাহিত্যের অন্যতম উদ্দেশ্য হল- 'সত্য'কে প্রতিষ্ঠা দেওয়া। যে সত্য মানবের সত্য। মানবতার সত্য। মনুষ্যত্বের সত্য। যা 'মানুষ'কে প্রতিপাদন করে থাকে।

দলিত সাহিত্যের সীমাবদ্ধতা ও দলিত সাহিত্যের করণীয় :

দলিত সাহিত্যের কিছু কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। তা অস্বীকারের নয়। সেগুলি হল নিম্নরূপ-

১. দলিত সাহিত্য 'দলিতের সাহিত্য' হোক বা 'দলিতের দ্বারা' রচিত সাহিত্য হোক। কিন্তু তা যেন শুধুমাত্র দলিতের জন্য রচিত সাহিত্য না হয়ে ওঠে।

২. দলিত সাহিত্য নিছক মনোরঞ্জনের জন্য বা অবসর যাপনের জন্য লিখিত হবে না।

৩. দলিত সাহিত্যে শৈল্পিক নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে হবে।

৪. দলিত সাহিত্য 'আর্ট ফর আর্ট সেক'- এই কলাকৈবল্যবাদী ধারণাকে নস্যাৎ করে দিয়ে 'আর্ট ফর ম্যান সেক' ধারণায় বিশ্বাসী হয়ে উঠবে।

৫. দলিত সাহিত্যিকের জীবন অভিজ্ঞতার উপস্থাপনে যেন পুনরাবৃত্তি না আসে।

৬. দলিত সাহিত্য কখনোই বিচ্ছিন্নতাবাদী হয়ে উঠবে না।

৭. দলিত সাহিত্য ভাবনাকে কেবলমাত্র বৌদ্ধদের মধ্যে সীমায়িত সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না।

৮. কোনো তত্ত্বকে বা মতবাদকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার প্রয়োজনে দলিত গল্প বা কবিতা বা উপন্যাস রচনা কখনই সমীচীন নয়। গল্পের আখ্যানে, কবিতার সত্যে,উপন্যাসের কাহিনিকে কার্যকারণ পরম্পরায় সন্নিবেশের প্রয়োজনেই স্বতোৎসারিত ভাবে মতবাদ হিসেবে উঠে আসাই শ্রেয়।

৯. দলিত সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে কোনো দলিতের হীনমন্যতার ভাব ও বোধ প্রকাশ পাবে না।

১০. সর্বোপরি, দলিত লেখকরা যে সাহিত্য-সমাজের অন্যান্যদের থেকে আলাদা এই অহংবোধ থেকে দলিত লেখকদের শত যোজন দূরে অবস্থান করা উচিত।

দলিত সাহিত্যের ভবিষ্যৎ :

ব্লাক-দলিত কিংবা আফ্রো-আমেরিকান সাহিত্যিকদের সৃজনকর্মে যেমন প্যান-ইন্টারন্যাশনালিজম বা সর্ববিশ্বময়তার লক্ষন সুস্পষ্ট, তেমনি বাংলা দলিত সাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্যেও আছে সর্বভারতীয়তা। অবশ্য 'দলিত' এই শব্দটিকে বিনাশ সাধনের জন্য আজকের ভারতবর্ষে উচ্চবর্গের সাহিত্যিক কি বুদ্ধিজীবী সকলেই উঠে পড়ে লেগেছেন। 'দলিত' শব্দের বা দলিত সাহিত্যের প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি নিয়ে নানান তর্কবিতর্কের অন্ত নেই। তবে এ কথা ঠিক যে, এই শব্দটিকে তারা উপেক্ষা করতে পারছেন না। সে দিক থেকে বাংলা দলিত সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সত্যিই 'সম্ভাবনাময়'। এই

'সম্ভাবনাময়' কথাটি কেন বলা হল তার পিছনে যুক্তি আছে। আজ পর্যন্ত যে সমস্ত দলিত সাহিত্যিক আপন আপন রচনা কৃতিত্বে প্রকাশ ও প্রচারের আলোয় উঠে এসেছেন, তাঁদের সকলের নেপথ্যে আছে কোন না কোন প্রাতিষ্ঠানিক তকমাওয়ালা দেবী, মুখার্জি, চ্যাটার্জী, উপাধ্যায়, দাশগুপ্ত, সেনগুপ্ত, ভদ্র, বসু প্রমুখ পদবীধারী লেখক-লেখিকা কিংবা বুদ্ধিজীবীদের এক কলম প্রতিবেদন। এভাবেই অতীতে বাংলা দলিত সাহিত্যের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল। বর্তমানে সেই প্রবণতা বহুলাংশে কমেছে। এখন দলিত সাহিত্যিকরা নিজেরাই নিজেদেরকে আলোকিত করে থাকেন এবং এমন অনেক উচ্চবর্গের সাহিত্যিকরা আছেন যারা প্রত্যক্ষে অস্বীকার করলেও দলিত সাহিত্যের প্রভাবেই নিজেদের প্রভাবিত হওয়ার ঘটনা পরোক্ষে অস্বীকার করতে পারেন না।

তবে হ্যাঁ, আমরা নিজেদেরকে যতই প্রগতিশীল ভাবি না কেন, আমাদের ভারতীয় সমাজে এমনকি ভারতীয় মনে 'কাস্ট' একটি প্রতিষ্ঠানের মত জায়গা জুড়ে বসেছে। দলিত সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে ধীরে ধীরে বিনষ্ট করার গোপন আঁতাত তৈরি হয় সেই প্রতিষ্ঠানেই। শুধু তাই নয়, সেই 'কাস্ট' নামক প্রতিষ্ঠানের শীর্ষে বসে আছেন যারা তাদের দেখা যাচ্ছে বাংলা দলিত সাহিত্যের বিচারকের আসনে। এ যেন পুষ্করিণীর তীরে দাঁড়িয়ে গভীরতা নির্ণয়ের মত হাস্যকর ব্যাপার। দলিত হয়ে জন্মানো এবং দলন প্রক্রিয়ার দ্বারা শোষিত হওয়ার লিভ্ড এক্সপেরিয়েন্স অর্থাৎ যাপন অভিজ্ঞতা যাদের নেই সেই তারাই আবার বাংলা দলিত সাহিত্যের ভাগ্যবিধাতা। এ চিত্র যদি বাস্তবে আরো বৃহৎ আকার ধারণ করতে থাকে, তাহলে এমন একটা সময় আসবে যখন দেখা যাবে বাংলা দলিত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্বের শিরস্ত্রাণ পরিধান করে আছেন কোন না কোন অ-দলিত সাহিত্যিক। সেদিন বাংলা দলিত সাহিত্যের গোটা আকাশ অন্ধকারে যাবে ছেয়ে। তাই ফাঁপা ও ফাঁকা রাজুস্তুতি থেকে আত্মগত সাহিত্যকে মুক্তি না দিতে পারলে দলিত সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সংকীর্ণ হয়ে পড়বে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অ-দলিত সাহিত্য সংগঠনের আইডিওলজি চাইবে দলিত সাহিত্যিকদের তকমা ও পুরস্কার, সাদা বাংলায় বললে দাঁড়ায়– 'লেভেল সেঁটে দেওয়া'- সেটা যেন তাদের দ্বারাই ও তাদের প্রতিষ্ঠানে থেকে হয়। তাহলে দলিত ঐক্য আর সংঘবদ্ধ হতে পারবে না। দলিত সাহিত্যকে 'আমাদের' করে নেওয়া যাবে। একথা ভুললে চলবেনা রাজশক্তির উত্থান পতনের শুধু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নয়, সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতির জগতের মানুষের ভূমিকাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। 'রক্তকরবী' নাটকের অধ্যাপক তাইতো রাজার দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছিলেন। দলিত সাহিত্যিকগণ যদি পদ (পাঠক পড়বেন ক্ষমতা) পাদোদক এবং পুরস্কারের নেশায় মেতে ওঠেন; তাতে আর যাই হোক, নিরলস দলিত সাহিত্য সাধনা হবে না। তা বলে কি পুরস্কারের প্রয়োজন নেই? নিশ্চয় আছে বৈকি। বেদনার্ত আত্মনের যন্ত্রণার কথাকে প্রকাশ করার জন্য উৎসাহ প্রদান যদি সেই পুরস্কারের মহতী উদ্দেশ্য হয় তাহলে সেই পুরস্কার গ্রহণ আবশ্যক। কিন্তু যে পুরস্কারের উদ্দেশ্য সংকীর্ণ রাজনীতি বা ভোটব্যাঙ্ক বৃদ্ধি করা সে-পুরস্কার অবলীলায় ত্যাগ করা শ্রেয়; অন্তত বৃহত্তর পাঠকসমাজের স্বার্থে, বৃহত্তর দলিত মানবের মুক্তি আন্দোলনের স্বার্থে। সুতরাং এই অবিলোপী 'কাস্ট' নামক ইনস্টিটিউশনের থেকে উন্মুক্ত হয়ে মেরুদন্ড সোজা রেখে যেদিন দলিত সাহিত্যিক কিংবা বুদ্ধিজীবী তাঁরা তাঁদের সাধনা ধারাকে প্রবাহমান পারবেন সেদিন দলিতত্ব থেকে মুক্তির আলোকবর্তিকা হয়ে উঠবে বাংলা দলিত সাহিত্য। কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয় আর্থিক সমতার দ্বারা তো আর সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণ করা যায় না। সেজন্য নিরন্তর সারস্বত প্রতিরোধ গড়ে তোলা দরকার দলিত লেখকদের পক্ষ থেকে। তাইতো সামাজিক ক্ষেত্রে বর্ণবৈরিতা, ধর্মান্ধতা, লিঙ্গবৈষম্যের বিরুদ্ধে; অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পুঁজির কেন্দ্রীকরণের বিরুদ্ধে এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দলিতকরণের প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে কলম ধরে ভাবীকালের জাতি সমাজের পথরেখা খনন করে যাক আজকের দলিত সাহিত্যিকগণ। সাহিত্যকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে বিপ্লবের দ্বারা ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করুক দলিত লেখকগণ। তা নাহলে ঠান্ডা মাথায় দলিতের সৃষ্টিশীল প্রয়াসকে ক্ষমতার গঙ্গাজল ছিটিয়ে 'নিজেদের' করে নেবে এক সময় কিংবা বর্ণবাদের নাসিকাকুঞ্চনে নিক্ষেপ করবে অবজ্ঞার আস্তাকুড়ে। উচ্চবর্গীয় সংস্কৃতির আধিপত্যকামী ধর্ম, দর্শন ও মনস্তত্ত্বের খামখেয়ালিপনা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখাই হবে ভাবীকালের দলিত সাহিত্যিকদের মহৎ কাজ। আরেকটি বিষয় হচ্ছে দলিত সমাজের মধ্যে যাঁরা সৃজনবিশ্বে নাম-যশের দরুন একটু 'উঁচুতে' উঠে গেছেন তাঁদের অতিরিক্ত সজাগ থাকা জরুরী যে, কোনোক্রমেই যেন আত্মবিক্রীত হতে না হয়, যেন দলদাস বনে যেতে না হয়। শুধু

তাই নয়, নিজের সমাজে যাঁরা সৃজনশীল তাঁদেরকে অন্ধকার থেকে আলোকের পথে উঠিয়ে নিয়ে আসতে পারলেই দলিত সাহিত্য আন্দোলন যেমন শক্তিশালী হবে, দলিত সাহিত্যের ভবিষ্যৎ তেমনি হয়ে উঠবে আরো সম্ভাবনাময়। কেননা, সাহিত্যিক উত্তরাধিকার যদি তৈরি না করে যাওয়া যায়, তাহলে বাংলা দলিত সাহিত্যের পূর্বসূরীদের প্রদর্শিত পথ ও পন্থা কাল থেকে কালান্তরে যথার্থরূপে বাহন করে নিয়ে যাবে কারা?

পরিশেষে বলা যেতে পারে, ভারতীয় প্রেক্ষাপটে দলিত সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সুদূরপ্রসারী। কেননা, বর্ণব্যবস্থা ও জাতব্যবস্থার মতো এই সামাজিক ব্যাধি যতদিন উচ্চবর্গীয় মানসিকতার সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকবে ততদিন মানুষের মনের থেকে নীচতা দূরীভূত হবে না। ঘুচবে না দলিতের অপমানভার। ততদিন দলিত সাহিত্য আন্দোলন সমান ভাবে চলবে। ততদিন প্রচলিত অসাম্যের বিরুদ্ধে দলিতদের সাহিত্যিক বিদ্রোহ অক্ষুণ্ণ থাকবে। আসলে কাল ও সময় পেরিয়ে আমরা অনন্তের পথে যাত্রা করি। কালের যাত্রায় 'উল্টোরথের পালা' একদিন আসবে।[৬৫] 'উঁচু'তে আর 'নিচু'তে 'বোঝাপড়া' হবে। যারা মরতে বসেছিল তারা মাথা তুলে দাঁড়াবে। প্রতিষ্ঠা পাবে দলিতদের স্বাধিকার। ভবিষ্যতে তখন দলিত সাহিত্যের বাঁক বদল ঘটবে। সাহিত্যিক আন্দোলন সফল হলে তা হয়ে উঠবে বিশ্বজনীন।

কিন্তু এই ভবিষ্যৎ পথরেখাকে সুগম করে তুলতে হলে দলিত সাহিত্যকে আরো শৈল্পিক হয়ে ওঠা কর্তব্য। কেননা আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার বাস্তবায়নের মাধ্যম হিসেবে সাহিত্য সৃজন উত্তম পন্থা। কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতার অবসান ঘটলেও সেই সাহিত্যিক প্রয়াস যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় দলিত লেখকের সেদিকে লক্ষ রাখা জরুরি। রাজনৈতিক বদল হোক সাহিত্যের অস্তিত্ব রক্ষা করেই। বৈপ্লবিক পদ্ধতিতেই বৃহত্তর দলিত সমাজকে সাহিত্য-সংস্কৃতির জগতে টেনে আনাই হোক দলিত সাহিত্যিকদের প্রধান অভিপ্রায়। আর এ পথেই দলিতের একদিন 'ক্রমমুক্তি' ঘটবে। তখনই সফল হবে দলিত সাহিত্য আন্দোলন। তা না হলে বাংলা দলিত সাহিত্যের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হলেও তা কৃষ্ণময় হয়ে পড়বে।

তথ্যসূত্র :

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'সাহিত্য', 'সাহিত্যের তাৎপর্য', রবীন্দ্র রচনাবলী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, মার্চ, ১৯৮৯, পৃ. ৩০৩
২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'সাহিত্য', 'বাংলার জাতীয় সাহিত্য', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সভার বার্ষিক অধিবেশন পঠিত, রবীন্দ্র রচনাবলী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রকাশ-মার্চ, ১৯৮৯, পৃ. ৩৫১
৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ, 'বঙ্গীয় শব্দকোষ', দ্বিতীয় খন্ড-প-হ, সাহিত্য একাডেমী, নতুন দিল্লি, সংস্করণ-১৯৬৬, পৃ. ১৯৫০
৪. রায়চৌধুরী, বেণীমাধব (সম্পাদিত), সুধাংশু কুমার বসু ও তারক কুন্ডু অনূদিত, 'কালিদাস রচনা সমগ্র', 'রঘুবংশ', ষষ্ঠ সর্গ, স্বয়ংবর সভায় বর্ণনা, ৩৭ সংখ্যক শ্লোকের গদ্য অনুবাদ, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-এপ্রিল ১৯৮৭, পৃ. ১১০
৫. প্রাগুক্ত, অষ্টম সর্গ, 'অজ রাজার বিলাপ', ১৬৭ সংখ্যক শ্লোকের গদ্য অনুবাদ, পৃ. ১২৩
৬. এ.এস.হর্নবি, 'অক্সফোর্ড আডভ্যান্সড লার্নার্স ডিকশনারি অফ কারেন্ট ইংলিশ', অক্সফোর্ড ইউনিভর্সিটি প্রেস, অক্সফোর্ড, এইটথ্ এডিশন-২০১০, পৃ. ৫৭৬
৭. মুখোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ (সম্পাদিত), 'উজ্জ্বলনীলমণি', ভারবি প্রকাশন, কলকাতা, ১৩৭২, পৃ. ১৫৬
৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭
৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯
১০. মুখোপাধ্যায়, বিমল কুমার, 'সাহিত্য বিবেক', গ্রন্থমেলা, কলকাতা, পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ-ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪, পৃ. ৫৫
১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

১২. বিশ্বাস, ডক্টর অনিল, 'অতাথো ব্রাত্যজিজ্ঞাসা', নীতীশ বিশ্বাস (সম্পাদিত), 'দলিত সাহিত্য', ঐকতান গবেষণা সংসদ, কলকাতা, সংস্করণ-২০০১, পৃ. অ-১২
১৩. চট্টোপাধ্যায়, পার্থ, 'ভূমিকা', 'নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার ইতিহাস', গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), 'নিম্নবর্গের ইতিহাস', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ-এপ্রিল ১৯৯০, পৃ. ৩
১৪) প্রাগুক্ত, পৃ. ৩
১৫. এ.এস.হর্নবি, 'অক্সফোর্ড অ্যাডভান্সড লার্নার্স ডিকশনারি', অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, অক্সফোর্ড, এইটথ্ এডিশন-২০১০, পৃ. ১৫৪১
১৬. চক্রবর্তী স্পিভাক, গায়ত্রী, 'গণতন্ত্রের রহস্য', সমর সেন স্মারক বক্তৃতা, ২০১৭, অনুষ্টুপ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-জুন ২০১৯, পৃ. ৪৮
১৭. রানা, সন্তোষ ও কুমার রানা, 'পশ্চিমবঙ্গের দলিত ও আদিবাসী', (সূচিপত্র অংশ), পরিমার্জিত সংস্করণ, প্রথম গাঙচিল প্রকাশ-ডিসেম্বর ২০১৮, পৃ. ৭
১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪
১৯. মণ্ডল, ডক্টর চিত্ত ও ডক্টর প্রথমা রায় মণ্ডল (সম্পাদিত), 'বাংলার দলিত আন্দোলনের ইতিবৃত্ত', একুশ শতক, প্রথম একুশ শতক সংস্করণ- ১ ফেব্রুয়ারী, বইমেলা-২০১৬, পৃ. ২৫
২০. রানা, সন্তোষ ও কুমার রানা, 'পশ্চিমবঙ্গে দলিত ও আদিবাসী', গাঙচিল, কলকাতা, প্রথম গাঙচিল প্রকাশ-২০১৮, পৃ. ২০
২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২
২২. রানা, কুমার, 'পশ্চিমবঙ্গের দলিত জাগরণের সমস্যা ও সম্ভাবনা', সন্তোষ রানা ও কুমার রানা, 'পশ্চিমবঙ্গে দলিত ও আদিবাসী', গাঙচিল, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০১৮, পৃ. ১২৩
২৩. লিম্বালে, শরণ কুমার, 'দলিত নন্দনতত্ত্ব', মৃন্ময় প্রামাণিক (বাংলা অনুবাদ), তৃতীয় পরিসর, প্রথম প্রকাশ-এপ্রিল ২০১৭, পৃ. ৫১
২৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'রক্তকরবী', বিশ্বভারতী, কলকাতা, নতুন সংস্করণ, ২৫ বৈশাখ ১৩৬৭, পৃ. ৩৪
২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩
২৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'রক্তকরবী', বিশ্বভারতী, নতুন সংস্করণ-২৫ বৈশাখ, ১৩৬৭ পৃ. ৩৯
২৭. ঘোষ, শুভ্রজ্যোতি, বিবিসি বাংলা, দৈনিক, দিল্লি, সেপ্টেম্বর ২০১৮
২৮. চৌধুরী, ডক্টর কনিষ্ক, 'জাতের বিনাশ আম্বেদকর ও তাদের অবদান', ড্যাফোড্যাম, কলকাতা, প্রকাশ কাল, জানুয়ারি ২০১৯, পৃ. ১১
২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২
৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২
৩১. ত্রিবেদী, দর্শন, 'লিটারেচার অফ দেয়ার ওউন দলিত লিটারারি থিওরি ইন ইন্ডিয়ান কন্টেকস্ট দলিত লিটারেচার এ ক্রিটিক্যাল এক্সপ্লোরেশন', এডিটেড বাই অমরনাথ প্রসাদ অ্যান্ড এম.বি.গৈজান, স্বরূপ অ্যান্ড সন্স, ২০০৭, পৃ. ২
৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

("to me Dalit is not a caste. He is a man exploited by the social and economic tradition of this country. He does not believe in God, Rebirth, Soul, Holy book teaching separation, Fate and Heaven because they have made him a Slave, He does believe in Humanism. Dalit is a symbol of change and revolution." page-3)

৩৩. উইকিপিডিয়া ["a number of the people lowest cast in India, whom those of the four main castes were formerly forbidden to touch. Here formerly called- Taboo

(offensive)or untouchable."]

৩৪. ম্যাকডোনাল্ড, আর্থার এ. (এডিটর), 'এ সংস্কৃত টু ইংলিশ ডিকশনারি', অক্সফোর্ড, লন্ডন, লঙম্যান গ্রীন অ্যান্ড কোং, লন্ডন, ইউ কে, ১৮৯৩, ইউ কে-১৮৯৩, পৃ. ১১৭

৩৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ, 'বঙ্গীয় শব্দকোষ', (প্রথম খন্ড - অ-ন, সংস্করণ-১৯৬৬, সাহিত্য একাডেমী, নতুন দিল্লি, পৃ. ১০৮৯

৩৬. ডাঙলে, অর্জুন, 'দলিত সাহিত্য : অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ', দেবেশ রায় (সংকলিত ও সম্পাদিত), 'দলিত' সাহিত্য একাডেমী, নতুন দিল্লি, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৭, পৃ. ৬৫

৩৭. বিশ্বাস, ডক্টর অনিল, 'অতাথো ব্রাত্য জিজ্ঞাসা', নীতীশ বিশ্বাস সম্পাদিত, 'দলিত সাহিত্য', ঐকতান গবেষণা সংসদ, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০১, পৃ. অ-১৫

৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. অ-১৯

৩৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'গীতাঞ্জলি', ১০৮ সংখ্যক কবিতা, বিশ্বভারতী, কলকাতা, নতুন সংস্করণ-২৫ বৈশাখ, ১৩৪৯, পৃ. ১৩৬

৪০. কুমার রানা, 'পশ্চিমবঙ্গে জাগরণের সমস্যা ও সম্ভাবনা', সন্তোষ রানা ও কুমার রানা, 'পশ্চিমবঙ্গে দলিত ও আদিবাসী', গাঙচিল, কলকাতা, প্রথম গাঙচিল, প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০১৮, পৃ. ১২৪

৪১. লিম্বালে, শরণকুমার, 'সাদা পাতা', অনুবাদ চৈতালী চট্টোপাধ্যায়; দেবেশ রায় (সংকলিত ও সম্পাদিত), 'দলিত সাহিত্য', সাহিত্য একাডেমি, নতুন দিল্লি, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৭, পৃ. ১৯২-১৯৩

৪২. কুমার সিংহ, ডক্টর কমল, 'সনাতন ও প্রগতিশীল বনাম দলিত সাহিত্য', নীতীশ বিশ্বাস (সংকলিত ও সম্পাদিত), 'দলিত সাহিত্য', ঐকতান গবেষণা সংসদ, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ-২০০১, পৃ. ৯৮

৪৩. ডাঙলে, অর্জুন, 'দলিত সাহিত্য : অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ', দেবেশ রায় (সংকলিত ও সম্পাদিত), 'দলিত', সাহিত্য একাডেমী, নতুন দিল্লি, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৭, পৃ. ৩৯

৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

৪৫. চ্যাটার্জী, দেবী, 'মানবাধিকার ও দলিত', ক্যাম্প, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০১৪, পৃ. ৩১

৪৬. রায়, দেবেশ, 'ভূমিকা', 'আত্মপরিচয় : ভাঙ্গন ও উন্মোচন', দেবেশ রায় (সংকলিত ও সম্পাদিত), 'দলিত', সাহিত্য একাডেমী, নতুন দিল্লি, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৭, পৃ. ৮

৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

৪৮. বিশ্বাস, মনোহরমৌলি, 'দলিত সাহিত্যের দিগবলয়', ড. আম্বেদকর প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ-মহালয়া ১৯৯২, পৃ. ১৫

৪৯. মালাগাট্টি, ড. অরবিন্দ, 'কানাড়া দলিত সাহিত্য', নীতিশ বিশ্বাস (সংকলিত ও সম্পাদিত), 'দলিত সাহিত্য', দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ঐকতান গবেষণা পত্র, ২০০১, পৃ. অ-৭৮

৫০. বিশ্বাস, নীতিশ (সংকলিত ও সম্পাদিত), 'দলিত সাহিত্য', দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ঐকতান গবেষণা পত্র, ২০০১, পৃ. অ-৫

৫১. প্রাগুক্ত, পৃ. ক-৬

৫২. রায়, অধ্যাপিকা ভারতী, 'দলিত সাহিত্যের অপর নাম প্রতিবাদী সাহিত্য', নীতিশ বিশ্বাস(সংকলিত ও সম্পাদিত), 'দলিত সাহিত্য', দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ঐকতান গবেষণা পত্র, ২০০১, পৃ. অ-১১১

৫৩. দত্ত, ভূপেন্দ্রনাথ, 'সাহিত্যে প্রগতি', প্রথম করুণা সংস্করণ, কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, সেপ্টেম্বর ২০০৮, পৃ. ৯

৫৪. রায়, দেবেশ, ভূমিকা, 'আত্মপরিচয়ের ভাঙন ও উন্মোচন', দেবেশ রায় (সংকলন ও সম্পাদনা), 'দলিত', প্রথম সংস্করণ, নতুন দিল্লি, সাহিত্য একাডেমি, ১৯৯৭; পৃ. ১৮

৫৫. বিশ্বাস, মনোহরমৌলি, 'দলিত সাহিত্যের রূপরেখা', প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, বাণীশিল্প, ২০০৭, পৃ. ১১
৫৬. প্রাগুক্ত
৫৭. বিশ্বাস, ডঃ অচিন্ত্য, 'দলিত সাহিত্য', নীতিশ বিশ্বাস (সংকলিত ও সম্পাদিত), 'দলিত সাহিত্য', দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ঐকতান গবেষণা পত্র, ২০০১, পৃ. অ-৩০
৫৮. প্রাগুক্ত
৫৯. বিশ্বাস, মনোহরমৌলি, 'দলিত সাহিত্যের রূপরেখা', প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, বাণীশিল্প, ২০০৭, পৃ. ১১
৬০. বালা, যতীন, 'দলিত সাহিত্য আন্দোলন', প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, চতুর্থ দুনিয়া, ২০০২, পৃ. ৬৭
৬১. ঘোষ, শঙ্খ, 'জার্নাল', সপ্তম মুদ্রণ, কলকাতা, দেজ পাবলিশিং, ১৩৯২, পৃ. ৪৬
৬২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'রক্তকরবী', নতুন সংস্করণ, কলকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৬৭, পৃ. ৩২
৬৩. বিশ্বাস, মনোহরমৌলি, 'দলিত সাহিত্যের রূপরেখা', প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, বাণীশিল্প, ২০০৭, পৃ. ৯৯
৬৪. প্রাগুক্ত
৬৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'কালের যাত্রা', পরিবর্ধিত সংস্করণ, কলকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৭৮, পৃ. ৪৫